অক্টোবর, ২০২৬ ৯৮

রোজকার

অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

আগমনি
১৪৩৩



সম্পাদকীয়



শিউলির সুবাস, কাশফুলের দোলা আর নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের ভেলা, শরতের এই চিরচেনা আয়োজনেই মন বলে ওঠে, মা আসছেন। তাঁকে ঘিরেই ফিরে আসে শৈশবের স্মৃতি, পুরনো দিনের মায়া, প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো অমূল্য মুহূর্ত আর নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন। দুর্গাপুজো তাই শুধু উৎসব নয়, এ আমাদের হৃদয়ের টান, শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া, ভালোবাসার এক চিরন্তন ঠিকানা। 'আগমনী ১৪৩৩' সেই ভালোবাসারই এক আন্তরিক শব্দসজ্জা। এই আয়োজনে মিশে আছে নারীশক্তির বহুরূপী প্রকাশ, ফেলে আসা পুজোর স্মৃতিকথা, রসনাবিলাসের নানা স্বাদ, রহস্য-রোমাঞ্চে মোড়া গল্প আর কোজাগরীর স্নিগ্ধ আবেশ। কখনও স্মৃতির হাত ধরে, কখনও কল্পনার পথে হেঁটে, কখনও বা উৎসবের চেনা গন্ধে। এই সংখ্যার প্রতিটি আয়োজন পাঠককে ছুঁয়ে যাক আপন অনুভবে।

সময় বদলায়, বদলে যায় পুজোর রং, সাজ আর উদ্‌যাপনের ধরন। তবু মায়ের আগমনের অপেক্ষা আজও একই রকম। আজও নতুন জামার গন্ধে, ঢাকের শব্দে, অঞ্জলির প্রার্থনায় আর প্রিয়জনের মুখের হাসিতে আমরা খুঁজে পাই জীবনের আসল আনন্দ। এই উৎসব আমাদের শেখায়, অন্ধকার পেরিয়েও আলো আসে, বিচ্ছেদের পরেও ফিরে আসে মিলনের দিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র নিবেদন যদি উৎসবের ব্যস্ততার মাঝে তোমার মনে একটুখানি নস্টালজিয়া জাগায়, ফিরিয়ে দেয় হারিয়ে যাওয়া কোনও মুহূর্ত কিংবা ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তোলে এক চিলতে হাসি, তবেই 'আগমনী ১৪৩৩'-এর সার্থকতা।

মায়ের আগমনে সবার জীবন ভরে উঠুক শান্তি, আনন্দ আর ভালোবাসায়। পুরনো দুঃখ মুছে যাক, নতুন স্বপ্নেরা ডানা মেলুক। হৃদয়ের প্রতিটি কোণে বাজুক আগমনী সুর। দুর্গাপূজা ও নবরাত্রির আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই সকল পাঠক/পাঠিকা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। পুজো সবার খুব ভালো কাটুক।

শুভকামনাসহ,

দেবাশ্রী মুখোপাধ্যায়

রোজকার অনন্যা পরিবার

সম্পাদক



দেবযানী মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ



সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার



কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র



স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়



বিনোদন
তৃষা নন্দী



গ্রাফিক্স ও অলঙ্করণ
সৌরভ ঘোষ



ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা



বিজ্ঞাপন বিভাগ
অভিষেক কর্মকার

একটি
দেবী প্রণাম
প্রকাশনা

যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com

দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

যত্নে থাকুক ভালোবাসার ছোঁয়া।

শিশু থেকে বড়, প্রতিদিনের পরিচর্যায়
ভরসার নাম শালিমার নারকেল তেল..



Shalimar's®

— www.shalimars.com —

FOLLOW US ON

সূচীপত্র

রোজকার অনন্যা
রোজকার সাথে যেটেছে, সাথে রোজকার রসদযাত্রা
অক্টোবর, ২০২৬





সাক্ষাৎকার
দশ রূপে দশভূজা
সুলগ্না ভট্টাচার্য
৭



ছেলেবেলার বা যৌবনের দুর্গাপুজো
কমলেন্দু সরকার
৩৯



পুজোর পাঁচদিন, পাতে পাতে উৎসব
৪৫

মৌসুমী দাস



সুতপা বৈদ্য

সুস্মিতা দে দাস



স্বর্ণাভ হালদার

মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল

একটি ভয়ঙ্কর গল্প
রজতশুভ্র মজুমদার
৭২



যে শহর গুহার মতোই
রাহুল দাশগুপ্ত
৭৬



বাঘ বন্দী খেলা
আবীর গুপ্ত
৮০



গোধূলি শেষের সন্ধে তারা
শ্রী সদ্যোজাত চাকলাদার
৮৬



কোজাগরীর আয়োজনে
মনমিতা কুণ্ডু
৯২



দুগ্গাপুজোয় আমিষ ভোগ
সুস্মিতা মিত্র
১০৩



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হালকা রান্না, জমজমাট স্বাদ।

প্রতিদিনের রান্নায় সহজ, সুস্বাদু পছন্দ শালিমার সানফ্লাওয়ার তেল..



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON

আগমনী ১৪৩৩

সাক্ষাৎকার

দশ রূপে দশভূজা



দশ হাতে দশ অস্ত্র নিয়ে দেবী দুর্গা মহিষাসুরবধ করেন, এ আমাদের সকলের কাছে চিরচেনা ছবি। কিন্তু আজকের দিনে দশভূজা হওয়ার অর্থ কি শুধুই দশটি কাজ একসঙ্গে সামলে নেওয়া? নাকি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু?

তাই দেবীর দশভূজা রূপকে আমরা শুধু মণ্ডপের প্রতিমায় নয়, খুঁজে নিতে চেয়েছি আমাদের চারপাশের নারীদের মধ্যেও। সেই নারী, যিনি এক হাতে সংসার সামলান, অন্য হাতে প্রতিনিয়ত বুনে চলেন স্বপ্ন; একদিকে নিজের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখেন, অন্যদিকে অন্যের জীবনেও আলো জ্বালান। এক জীবনে এতগুলি পরিচয় কীভাবে সামলে ওঠেন একজন নারী?

জানতে পড়ুন, সুলগ্না ভট্টাচার্য -এর বিশেষ সাক্ষাৎকার।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



sprish

আগমনী

FESTIVE
COLLECTIONS

STORE
Ground Floor, P 79, Lake Terrace Rd, lake Terrace
Gariahat, Kolkata, West Bengal 700029

ALSO AVAILABLE ON:

www.sprishstudio.com

amazon Myntra JioMart indya Flipkart AJIO



প্রশ্ন: আপনার জীবনে নৃত্যশিল্পী হওয়ার শুরুটা কীভাবে?

উত্তর: আমার নাচের journey শুরু খুব ছোটবেলায়—বয়স তখন সাড়ে তিন কি চার। আর হাতেখড়িটাও ঠিক যেভাবে একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে হয়—ছোটবেলায় নাচ, গান, আঁকা, সবই একটু একটু করে শিখতে হবে! সেই ভাবনা থেকেই মা প্রথমে বাড়িতে একজন দিদিকে ঠিক করেছিলেন আমাকে কত্থক শেখানোর জন্য। কিন্তু একা একা নাচ শেখা, বিশেষ করে ওই বয়সে, মোটেই খুব আকর্ষণীয় ছিল না। যথারীতি আমারও ভালো লাগেনি।

তারপর মা আমাকে একটি ওড়িশি নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে আমার এক বন্ধুও নাচ শিখত। সত্যি বলতে, প্রথমদিকে ওড়িশির চেয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগ্রহটাই হয়তো একটু বেশি ছিল!

আর আমি যে ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব নিষ্ঠাবান ছাত্রী ছিলাম, এমন দাবি করলে ইতিহাসকে খানিকটা বিকৃত করা হবে। বাড়িতে practice করতে একেবারেই ভালো লাগত না—পায়ে ব্যথা করত! ফলে ক্লাসের দিন যত এগিয়ে আসত, বুকের মধ্যে ততই একটা অদ্ভুত দুরুদুরু শুরু হত। কারণ খুব ভালো করেই জানতাম—practice করিনি, আজ বকা অবধারিত। আজ ফিরে তাকিয়ে মজা করে বলি, ওটাই ছিল আমার ছোটবেলার নিজস্ব 'butterfly effect'!

তবে ওই বয়সে নাচের প্রতি টান তৈরি হওয়ার পিছনে আর একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল—encouragement। বাড়ির মানুষ, আত্মীয়স্বজন যখন জিজ্ঞেস করতেন, "হ্যাঁ রে, তুই নাচ শিখিস? দেখি তো কী শিখেছিস!"—তখন ওই ছোট্ট বয়সেই নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হত। দু'পা নেচে দেখালেই প্রশংসা, হাততালি—সেটা একটা শিশুর মনে যে কী অসম্ভব আনন্দ তৈরি করে, তখন বুঝিনি।

তারপর এল মঞ্চ। এত আলো, এত মানুষ, দর্শকের সামনে সাজগোজ করে নাচব—আমার কাছে সেটা ছিল প্রায় অন্য একটা জগৎ। মঞ্চে উঠে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ

সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন

ADI READYMADE CENTRE PVT. LTD.

স্টেশন রোড, সোদপুর

অনলাইন-এ শপিং এর জন্য দেখুন
www.adireadymadecentre.net

যোগাযোগ করুন
98301 17563/70033 84398

ইমেইল adircpl@gmail.com
আমাদের ফলো করুন

যখন দেখতাম সামনে এত মানুষ আমার নাচ দেখছেন, তারপর হাততালি দিচ্ছেন, সেই অনুভূতিটা আমাকে আরও একটু করে নাচের দিকে টেনে নিয়েছিল। আজ বুঝি, একটি শিশুর শিল্পী হয়ে ওঠার পথে সেই ছোট ছোট encouragement কতটা গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো তখন আমি 'শিল্প' বুঝতাম না, কিন্তু appreciation-এর আনন্দটা বুঝতাম।

অথচ মজার ব্যাপার হল, যে ক্লাসে যাওয়ার আগে একসময় ভয় পেতাম, যে practice এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত খুঁজতাম, সেই ওড়িশিই ধীরে ধীরে আমার জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী সম্পর্ক হয়ে উঠল।

তাই আমার নৃত্যশিল্পী হয়ে ওঠার গল্পটা কোনও dramatic calling দিয়ে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল সাড়ে তিন-চার বছরের একটা বাচ্চার খুব সাধারণ পৃথিবী থেকে—মায়ের ইচ্ছা, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আনন্দ, practice না করার ভয়, আত্মীয়দের "দেখি তো নেচে", একটু প্রশংসা, একটু হাততালি আর মঞ্চের আলো। তারপর কখন যে হাততালি পাওয়ার জন্য নাচা থেকে নাচটাই আমার নিজের ভাষা হয়ে উঠল—সেই বদলটা বোধহয় আমিও টের পাইনি।

প্রশ্ন: সংসার, সন্তান, পেশা, এই সবকিছুর মাঝে নিজের শিল্পীসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক কতটা কঠিন?

উত্তর: সত্যি বলতে, আমার কাছে এই তিনটে আলাদা নয়। সংসার, মাতৃত্ব আর আমার শিল্পীসত্তা—সবটাই তো আমার ভালোবাসা থেকে তৈরি। তাই একটাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে আরেকটার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে, বিষয়টাকে আমি ঠিক সেভাবে দেখি না। বরং জীবনের এক-একটা পর্যায় আমাকে এক-একভাবে সমৃদ্ধ করেছে, আর সেই অভিজ্ঞতাগুলোই শেষ পর্যন্ত আমার শিল্পের মধ্যে এসে মিশেছে।

প্রেম, দাম্পত্য, মাতৃত্ব কিংবা জীবনের নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতির পরিধিটা ক্রমশ বড় হয়। একজন শিল্পীর কাছে সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। মঞ্চে আমরা যে শৃঙ্গার, বাৎসল্য, বিরহ, করুণা কিংবা অন্য কোনও রস প্রকাশ করি, সেগুলো তো শেষ পর্যন্ত মানুষেরই অনুভূতি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই অনুভূতিগুলোকে যখন নিজে ছুঁয়েছি, তখন মঞ্চে তাদের প্রকাশ করার ভাষাটাও আমার কাছে আরও গভীর হয়েছে। যে অনুভূতি একসময় শুধু শিখে portray করতাম, জীবনের অভিজ্ঞতার পরে হয়তো সেই একই অনুভূতিকে এখন অনেক বেশি ভিতর থেকে উপলব্ধি করতে পারি। নাচ আমাকে evolve করেছে, সংসার আমাকে patience শিখিয়েছে, আর মাতৃত্ব আমাকে prioritise করতে শিখিয়েছে। মাতৃত্বের পরে সময়ের মূল্য যেমন নতুনভাবে বুঝেছি, তেমনই একটি শিশুর মন, তার আবেগ, তার নিজস্ব পৃথিবীটাকেও অন্যভাবে দেখতে শিখেছি।

আবার কখনও কখনও আমার মনে হয়, ব্যাপারটা উল্টোদিক থেকেও সত্যি। মা হওয়ার অনেক আগে থেকেই আমি তো আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর 'মা' হয়েছি। বছরের পর বছর বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের শেখাতে গিয়ে তাদের অভিমান, ভয়, জেদ, আনন্দ, attention span—এই ছোট ছোট মনস্তত্ত্বগুলো বুঝতে শিখেছি। হয়তো সেই কারণেই নিজের মেয়েকে বোঝাটাও আমার কাছে অনেকটা সহজ হয়েছে।

তাই আমার ক্ষেত্রে শিল্প আর জীবন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়—বরং একে অপরের শিক্ষক। জীবন আমাকে অনুভব করতে শেখায়, আর নাচ সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করার ভাষা দেয়।

আর হয়তো সেই কারণেই আমি মনে করি, একজন শিল্পী শুধু রেওয়াজে তৈরি হন না—তিনি তৈরি হন বেঁচে থাকার মধ্য দিয়েও।

প্রশ্ন: আজকের প্রজন্মের কাছে শাস্ত্রীয় নৃত্যকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কী করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আজকের দিনে শুধু বাচ্চাদের নয়, বড়দেরও attention span অনেকটাই কমেছে—social media-র যুগে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কোনো কিছু দেখে তার প্রতি আগ্রহী হব কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। Covid-এর পর প্রায় প্রতিটি sector-এই অনেক কিছু বদলেছে, আর performing arts-ও তার বাইরে নয়। আজ আর audience-এর কাছে পৌঁছনোর একমাত্র মাধ্যম stage নয়। Digital platform এবং social media-র মাধ্যমে আমাদের exposure যেমন বহুগুণ বেড়েছে, তেমনই competition-ও বেড়েছে প্রায় দশগুণ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের অসাধারণ শিল্পীকে আজ একজন দর্শক নিজের ফোনে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই সময়ের সঙ্গে আমাদের approach-ও যদি না বদলায়, তাহলে আগামী প্রজন্মের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, **বেহালাঃ** 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, **বারাসাতঃ** হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, **কৃষ্ণনগরঃ** কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513
Shop Now : www.priyagopalbishoyi.com



attention ধরে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে।

তবে আমার কাছে approach বদলানো মানে classical dance-এর মূল কাঠামো, sanctity বা purity-কে বদলে দেওয়া নয়। বরং আমি বলব—পুরোনো খাবার, কিন্তু নতুন presentation। তার স্বাদ, তার উপকরণ, তার নিজস্বতা একই থাকবে; শুধু কীভাবে সেটি পরিবেশন করছি, সেখানে সময়ের সঙ্গে কিছু নতুন ভাবনা আসতে পারে। Classical dance-এর grammar, depth এবং tradition অক্ষুণ্ণ রেখেই presentation-কে contemporary audience-এর কাছে আরও relatable এবং engaging করে তোলা সম্ভব।

শেখানোর ক্ষেত্রেও আমি একই কথা বিশ্বাস করি। শুধু হাত-পায়ের position দেখিয়ে যদি একটি বাচ্চাকে বলা হয়—"এটা করো, তারপর এটা করো"—তাহলে কিছুদিন পরে তার কাছে নাচটা mechanical হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি দেখেছি, একেবারে শুরু থেকেই যদি তাকে বোঝানো হয় কেন এই movement-টা করছি, এই mudra-র অর্থ কী, এই expression-এর পিছনে কী গল্প বা emotion আছে—তাহলে তার curiosity তৈরি হয়।

বাচ্চারা depth বুঝবে না—এই ধারণাটার সঙ্গে আমি একমত নই। বরং তাদের বয়স অনুযায়ী সহজ ভাষায় depth-টা বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা অনেক বেশি interested হয়। তখন সে শুধু choreography মুখস্থ করছে না; সে বুঝতে শুরু করছে সে কী বলছে। আমার কাছে আগামী প্রজন্মকে classical dance-এর সঙ্গে যুক্ত রাখার পথটা তাই tradition-কে সহজ করে দেওয়া নয়—tradition-এর গভীরতাকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভাষাটা নতুন করে খুঁজে নেওয়া।

প্রশ্ন: একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পথ চলতে গিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



India's First Online Saree Store's Signature Outlet

P8, Tagore Park, RN Tagore Road, Dunlop, Kolkata : 700056
(Near Baranagar Metro Station)

Follow us on

9830906302 / 9830424928 | 9674678024

Available on

উত্তর: নাচের profession-এ আমার মনে হয় সব gender-এরই নিজস্ব কিছু challenge আছে—বিশেষ করে Indian classical dance-এর ক্ষেত্রে। কারণ আমাদের society এখনও পুরোপুরি traditional gender roles থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবে তারও আগে একটা বড় সমস্যা হল, আমাদের সমাজে নাচকেই এখনও অনেকাংশে একটা proper profession হিসেবে দেখা হয় না। অনেকের কাছেই এটা hobby বা extra-curricular activity।

এই mindset-টা যে এখনও কতটা deeply rooted, সেটা আমি নিজের জীবনেই দেখি। আমাকে এখনও অনেক relative খুব casually জিজ্ঞেস করেন—"কিরে, নাচ করছিস এখনও?" প্রশ্নটা হয়তো একেবারেই innocent, কিন্তু আমার কাছে খুব interesting লাগে। কারণ কেউ সাধারণত একজন doctor, lawyer বা corporate professional-কে কয়েক বছর পর জিজ্ঞেস করেন না—"তুমি এখনও ওটা করছ?" কিন্তু নাচের ক্ষেত্রে কোথাও যেন ধরে নেওয়া হয়, এটা জীবনের একটা phase—ছোটবেলায় শেখা যায়, কিছুদিন stage করা যায়, তারপর একটা সময় "বাস্তব জীবন" শুরু হলে ছেড়ে দিতে হয়।

এই mindset-টা একেবারে ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। স্কুলে পরীক্ষা থাকলে সপ্তাহে একটা দু'ঘণ্টার নাচের class-ও বাদ দেওয়া হয়। অথচ আমরা খুব কমই ভাবি যে একটা বাচ্চা যদি ভবিষ্যতে professional dancer হতে চায়, তাহলে এই training-টাও তার education-এরই একটা অংশ। অবশ্যই exception আছে, অনেক পরিবার এখন খুবই supportive, কিন্তু overall perception-এ এখনও অনেকটা পরিবর্তন প্রয়োজন। ছেলেদের ক্ষেত্রে একটা খুব common expectation থাকে—আগে financially secure হও, একটা চাকরি করো, তারপর যা ইচ্ছে করো। কারণ পরিবারের income বা financial responsibility-র সঙ্গে পুরুষকে জুড়ে দেখার social conditioning এখনও খুব strong। মেয়েদের ক্ষেত্রেও কথাটা অন্যভাবে আসে—"আগে একটা proper চাকরি করো", অথবা বিয়ের পরে "সংসারের দায়িত্বগুলো শেষ করে তারপর নাচ করো।"

এখানে একটা practical reality-ও অস্বীকার করা যায় না। একজন artist-এর জীবনে income অনেক সময়ই uncertain। বিশেষ করে career-এর প্রথম দিকে financial stability তৈরি করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু সেই কারণেই আমার মনে হয় dance education-কে আরও structured academic curriculum-এর মধ্যে আনা প্রয়োজন। Training, theory, history, performance, pedagogy—সবকিছুকে যদি একটা proper academic এবং professional framework-এর মধ্যে দেখা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে নাচকে profession হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাও বদলাবে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আরও একটা layer যোগ হয়—family এবং motherhood। এই জায়গাটা আমি শুধু বাইরে থেকে দেখিনি, নিজের জীবনেও অনুভব করেছি। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে family, নিজের responsibilities এবং একজন dancer হিসেবে নিজের identity—সবকিছুকে একসঙ্গে carry করতে হয়। তখন কোন মুহূর্তে কোনটাকে priority দেব, সেই balance-টা সবসময় সহজ হয় না।

বিশেষ করে pregnancy এবং postpartum-এর সময় আমি আরও কাছ থেকে বুঝেছি, একজন মহিলা dancer-এর কাছে এই সময়টা কতটা complex হতে পারে। কারণ পরিবর্তনটা শুধু physical নয়—mental এবং situational-ও। আর একজন dancer-এর ক্ষেত্রে নিজের শরীরটাই তো তার instrument। সেই শরীর যখন বদলায়, তখন শুধু appearance নয়—strength, stamina, movement, নিজের শরীরের উপর confidence—অনেক কিছুই নতুন করে বুঝতে হয়। নিজের body-র সঙ্গে যেন একটা নতুন relationship তৈরি করতে হয়।

একজন মা হওয়ার আনন্দ যেমন আছে, তেমনই একজন performing artist হিসেবে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসার একটা লড়াইও আছে। কখনও family-কে priority দিতে হয়, কখনও profession-কে; আর অনেক সময় দুটোকে আলাদা করাও সম্ভব হয় না। নিজের ক্ষেত্রে এই balance করতে গিয়েই আমি বুঝেছি, একজন female artist-এর career সবসময় একটা straight line-এ এগোয় না। মাঝখানে pause আসতে পারে, priorities বদলাতে পারে—কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার artistic journey শেষ হয়ে গেল।

তার সঙ্গে আসে audience এবং society-র expectation। একজন female dancer-এর body কেমন "দেখানো উচিত"—এই expectation-টা খুব

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com


Amader
PUJO
LOOK
MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS
Bhaskar Sriniketan
STORE • BEHALA
+(91)-89103 75304/89103 86709
bhaskarsriniketanbehala



strong। Pregnancy এবং postpartum-এর পরে body naturally বদলায়, কিন্তু audience সবসময় সেই পরিবর্তনকে একই sensitivity দিয়ে দেখে না। Social media-র যুগে তার সঙ্গে trolling এবং unsolicited comments-ও রয়েছে। একজন artist হিসেবে তখন নিজের শরীরকে আবার accept করা এবং একই সঙ্গে audience-এর gaze-এর সামনে দাঁড়ানো—দুটোই একটা journey।

তাই আমার মনে হয় একজন dancer-কে আমরা stage-এ যে কয়েক মিনিট দেখি, শুধু সেটা দিয়ে তার journey-টা বিচার করা উচিত নয়। সেই performance-এর পিছনে training-এর পাশাপাশি family, responsibilities, financial uncertainty, physical changes, mental adjustments—অনেক অদৃশ্য লড়াই থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের যে জায়গাটা বদলানো সবচেয়ে জরুরি, সেটা হল mindset। নাচ আমার কাছে এমন কিছু নয় যেটা আমি "এখনও করছি"; এটা আমার profession, আমার education এবং আমার জীবনের একটা fundamental অংশ।

যেদিন একটা dance class miss করাকে আমরা একটা academic class miss করার মতোই গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শিখব, আর একজন dancer-কে "নাচটা এখনও করছ?" প্রশ্নটা করার প্রয়োজন অনুভব করব না—সেদিন হয়তো বুঝব যে performing arts-কে profession হিসেবে দেখার জায়গায় সত্যিই একটা পরিবর্তন এসেছে।

প্রশ্ন: ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে আপনার ডিজাইনের নিজস্ব ভারসাম্যটা ঠিক কোথায়?

উত্তর: নাচের ক্ষেত্রে আমার যে চিন্তাভাবনা, fashion-এর ক্ষেত্রেও আসলে অনেকটা একই—classic silhouette in a modern situation। আমার কাছে modern

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



Dr. Sohini Sastri

2 times President award winning
world renowned Astrologer

Phone No.
+91 9163532538 / +91 9038136660

Website:
https://sohinisastri.com/

হওয়ার অর্থ নিজের roots-কে সরিয়ে দেওয়া নয়; বরং সেই roots-কে আজকের সময়ের ভাষায় নতুন করে present করা।

কারণ কিছু fashion শুধুমাত্র আমাদের সাজ নয়, আমাদের identity।

একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই—Bollywood-এ একজন modern Bengali woman-কে visually establish করতে গেলেও আমরা প্রায়ই দেখি শাড়ি, একটু ধ্যাবড়া কাজল, টিপ, নাকছাবি এবং একটা strong personality। আবার সাবেকি বাঙালি সাজ বললেই আমাদের চোখের সামনে আসে লালপাড় শাড়ি, আলতা, সিঁদুর, সাবেকি গয়না, কখনও curly hair। বাঙালি বিয়ের কথা ভাবলে লাল বেনারসি, চন্দনের কলকা আর শোলার মুকুট—এই visual vocabulary-গুলো এতটাই আমাদের collective memory-র অংশ যে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। একটা সাধারণ দিনের সাজে ঢাকাই শাড়িও একইভাবে আমাদের cultural memory বহন করে।

আমার কাছে এগুলো শুধুমাত্র আবেগ বা nostalgia নয়—এগুলো আমাদের artistic heritage। একটা textile, একটা weave, একটা embroidery বা একটা traditional drape-এর মধ্যে একটা অঞ্চলের geography, history, craftsmanship এবং generations of knowledge লুকিয়ে থাকে।

কিন্তু heritage-কে preserve করার অর্থ এই নয় যে তাকে museum-এর মধ্যে রেখে দিতে হবে। একটা ঢাকাই শাড়ি যেমন তার original form-এ অসাধারণ, তেমনই সেই textile দিয়ে lehenga তৈরি হতে পারে। শাড়ি pre-stitched হতে পারে। Paithani দিয়ে একটা contemporary coat হতে পারে, তার সঙ্গে তাঁতের crop top—কেন নয়?

আমার কাছে interesting জায়গাটা ঠিক এখানেই—tradition-এর identity-টা অক্ষুণ্ণ রেখে তার application-টা বদলে দেওয়া।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যেরই এমন নিজস্ব একটা visual এবং intangible heritage আছে। আমাদের দেশে এত ধরনের weave, textile, embroidery, handwork, print এবং craft tradition রয়েছে যে একটা designer-এর কাছে এই vocabulary প্রায় endless। একটা lifetime-ও হয়তো যথেষ্ট নয় সবটা explore করার জন্য।

আর আমার নিজের খুব ইচ্ছে আছে ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের textile traditions নিয়ে কাজ করার—শুধু well-known fabrics নয়, regional weaves, hand embroidery, printing traditions এবং indigenous handwork-ও। আমি চাই সেগুলোর history এবং original character বুঝে তারপর contemporary silhouette-এর মধ্যে নিয়ে আসতে। কারণ আমার কাছে modernisation আর westernisation এক জিনিস নয়। Contemporary Indian fashion-এর নিজের একটা language তৈরি হতে পারে—যেখানে silhouette আজকের, styling আজকের, functionality আজকের, কিন্তু তার soul-টা unmistakably Indian।

নাচের ক্ষেত্রেও আমি যেটা বলি—পুরোনো খাবার, নতুন presentation—fashion-এর ক্ষেত্রেও আমার philosophy অনেকটা সেটাই। ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন করা নয়; ঐতিহ্যকে এতটাই জীবন্ত রাখা, যাতে নতুন generation সেটাকে নিজের মতো করে পরতে চায়।

ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে সাজগোজটা শুধু সুন্দর দেখানোর বিষয় ছিল না। হয়তো নাচের সঙ্গে বড় হয়েছি বলেই costume, colour, fabric, jewellery—এগুলোকে আমি কখনও আলাদা আলাদা করে দেখিনি। একটা পোশাক কীভাবে একটা character তৈরি করে, একটা সময়কে বোঝায়, এমনকি কোনো কথা না বলেও একজন মানুষ কোথা থেকে এসেছে সেটা বলে দেয়—এই ব্যাপারটা আমাকে বরাবরই খুব আকর্ষণ করে।

আর বাঙালি হিসেবে কিছু জিনিস তো আমাদের চোখে এতটাই চেনা যে সেগুলোকে আলাদা করে শেখারও প্রয়োজন হয় না। একটা লালপাড় শাড়ি, একটা ঢাকাই, কাজল, টিপ, আলতা, শোলার মুকুট—এগুলো দেখলেই কোথাও একটা খুব নিজের অনুভূতি হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি, সেই connection-টা শুধু nostalgia নয়। এগুলো আমাদের visual identity, আমাদের artistic heritage।

তাই নাচের ক্ষেত্রে আমার যে চিন্তাভাবনা, fashion-এর ক্ষেত্রেও আসলে অনেকটা একই। আমার কাছে modern হওয়ার অর্থ নিজের roots-কে সরিয়ে দেওয়া নয়; বরং সেই roots-কে আজকের সময়ের ভাষায় নতুন করে present করা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



WOMENSWEAR : SILK SAREES, COTTON SAREES, KURTIS, PALAZO, SALWAR KAMEEZ,
DESIGNER BLOUSE, DRESS MATERIALS.
MENSWEAR : SHIRT, PUNJABI, KURTA

KHADI GRAMODYOG BHAVAN

Dakshinapan
Shop no. G-95 to G-97
Dhakuria. Kol-68.
Phone. 40073809

10,Hindustan Park
Shop no.4
(Opp. Basanti Devi College)
Kolkata-29.
Phone. 8509787458

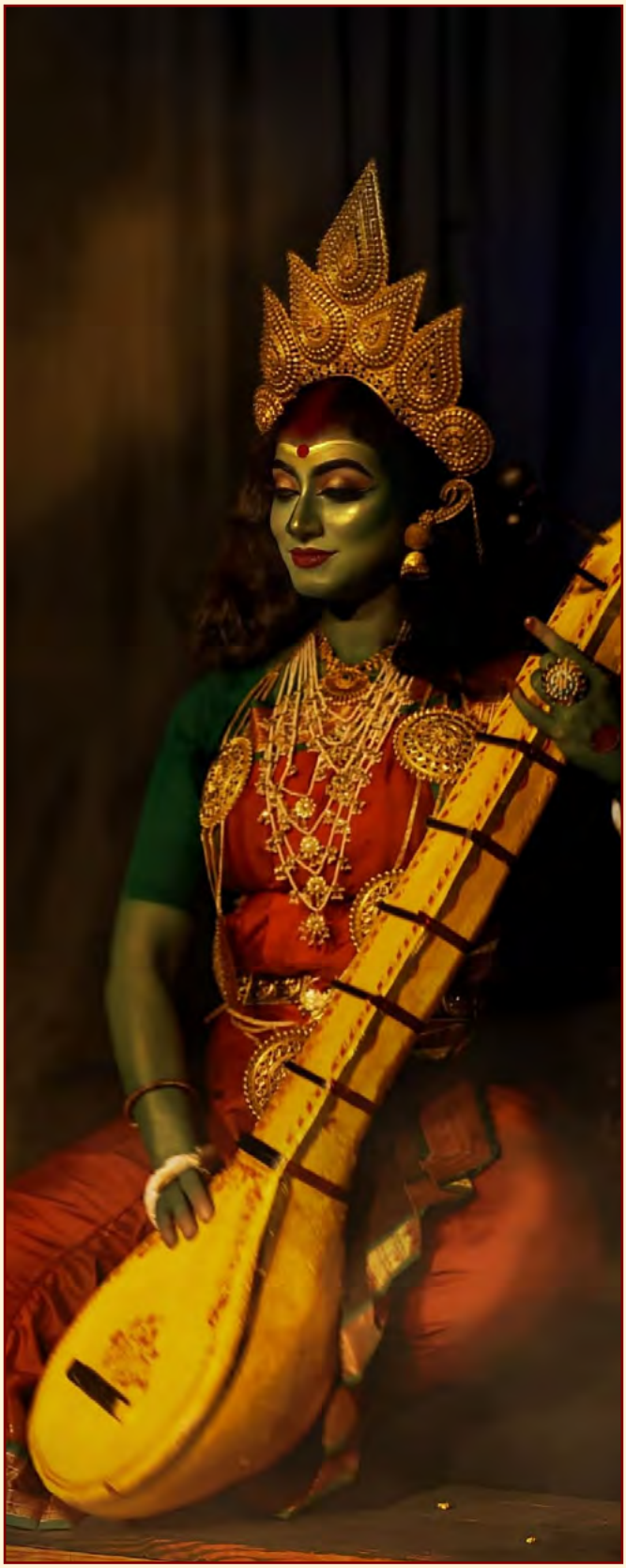

আর এখানে একটা জিনিস আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়—new generation-এর কাছে relevant হওয়ার জন্য সবসময় নতুন কিছু invent করতে হবে, আমি সেটা বিশ্বাস করি না। Classic silhouettes are classic for a reason. কিছু proportion, কিছু drape, কিছু construction সময়ের পরীক্ষায় টিকে গেছে কারণ সেগুলোর মধ্যে একটা inherent beauty এবং functionality আছে।

ধুতি নতুন নয়, coat-ও নতুন নয়। এমনকি coat-এর সঙ্গে dhoti-র combination-ও একেবারে নতুন কোনো invention নয়। তবুও আজকের একটা particular fabric, cut, styling বা occasion-এর মধ্যে সেটাকে রাখলে look-টা fresh মনে হতে পারে। আমার কাছে innovation অনেক সময় সেখানেই—form-টা নতুন না হলেও context-টা নতুন।

আমাদের lifestyle বদলেছে, তাই application-ও বদলাবে। আজ একজন মানুষ একই দিনে office করছেন, তারপর একটা social event-এ যাচ্ছেন; travel বেড়েছে, movement বেড়েছে, convenience-এর প্রয়োজন বেড়েছে। তাই traditional clothing-কে contemporary করতে হলে শুধু তার appearance নয়, তার usability নিয়েও ভাবতে হবে।

একটা saree pre-stitched হতে পারে, কিন্তু drape-এর character যেন হারিয়ে না যায়। একটা Paithani হয়তো full saree হিসেবে নয়, structured coat-এর panel হয়ে উঠল। একটা তাঁতের textile crop top, shirt বা relaxed trouser-এ এল। Dhakai দিয়ে lehenga হল। Jamdani হয়তো evening jacket-এর translucent layer হয়ে এল। Kantha শুধু শাড়ি বা stole-এ নয়, একটা beautifully tailored contemporary garment-এর detail হয়ে উঠল।

আমার কাছে এই জায়গাটাই exciting—textile-কে costume বানিয়ে না ফেলে everyday life-এর অংশ করে দেওয়া।

আর new generation-কে heritage-এর সঙ্গে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



বিশ্বম্ভর নাগ দাস এন্ড কোঃ

৬৭, বটতলা স্ট্রীট, বড়বাজার, কলকাতা- ৭০০০০৭

ফোন নং: ৯৩৩০৬৭৪৬০২

connect করানোর আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল education through design। আমরা অনেক সময় একটা beautiful saree বা garment দেখাই, কিন্তু তার গল্পটা বলি না। একজন young buyer যদি জানে একটা particular weave কোথা থেকে এসেছে, কে বানিয়েছে, একটা motif-এর অর্থ কী, কেন একটা technique করতে এত সময় লাগে—তাহলে তার কাছে garment-টা শুধু একটা product থাকে না।

এখানে technology-ও খুব interestingভাবে ব্যবহার করা যায়। একটা garment-এর tag-এ QR code থাকতে পারে—scan করলেই সেই weave-এর ছোট্ট story, artisan-এর পরিচয়, making process বা styling possibilities দেখা গেল। একটা 60-second reel-এ একটা textile-এর history বলা গেল। একই saree বা textile-কে একজন মা কীভাবে পরছেন আর তাঁর মেয়ে কীভাবে style করছেন—সেটাও দেখানো যায়। Heritage তখন textbook-এর বিষয় না থেকে conversation-এর অংশ হয়ে যায়।

আমি আরও চাই young people-কে শুধু "এটা আমাদের tradition, তাই পরো" বলা না হোক। সেটা হয়তো উল্টো distance তৈরি করে। বরং তাকে options দেওয়া হোক—"এটা তোমার heritage; তুমি এটাকে নিজের মতো করে কীভাবে ব্যবহার করবে?" একজন ২০ বছরের মেয়ে হয়তো পুরো Paithani saree পরতে চাইছে না, কিন্তু Paithani jacket ভালোবাসছে। একজন ছেলে হয়তো traditional dhoti-পাঞ্জাবি পরবে না, কিন্তু dhoti-inspired trouser-এর সঙ্গে একটা beautifully cut jacket পরবে। আমার কাছে সেটাও heritage-এর continuation। কারণ craft-টা তার জীবনে ঢুকছে।

এমনকি education school level থেকেও শুরু হতে পারে। আমরা যেমন children-কে painting, music বা history শেখাই, তেমনই ভারতের textile map-টাও খুব engagingভাবে শেখানো যায়—কোন রাজ্যের কোন weave, কোন embroidery, কোন print; হাতে textile touch করে দেখা, artisan demonstration দেখা, নিজের motif design করা। তখন fashion শুধু consumption নয়, cultural literacy-র একটা অংশ হয়ে উঠবে।

ভারতের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব একটা visual এবং intangible heritage আছে। এত ধরনের weave, embroidery, handwork, printing tradition রয়েছে যে আমাদের inspiration-এর জন্য বাইরে তাকানোর আগে নিজেদের ভাণ্ডারটাই হয়তো পুরো দেখা শেষ হবে না।

আমার নিজের খুব ইচ্ছে আছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের textile, handwork এবং prints নিয়ে কাজ করার। কিন্তু শুধু সেগুলোকে contemporary garment-এ বসিয়ে দেওয়ার জন্য নয়—আমি চাই মানুষ জানুক সে কী পরছে, কোথা থেকে এসেছে, আর তার পিছনে কার হাত রয়েছে।

কারণ আমার কাছে modernisation মানে heritage-কে disguise করা নয়। বরং এমনভাবে তাকে আজকের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে তার identity-টা আরও স্পষ্ট হয়।

নাচের ক্ষেত্রেও আমার philosophy একই। একটা classical composition-কে contemporary audience-এর কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে তার grammar বদলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই; presentation এবং communication বদলাতে পারে। Fashion-এও তাই। Classic-কে নতুন বানানোর দরকার নেই। Classic-কে নতুন generation-এর জীবনে আবার relevant করে তুলতে হবে।

আর আমার কাছে হয়তো সেটাই sustainability-র সবচেয়ে সুন্দর form—একটা craft-কে শুধু preserve করা নয়, এমন একটা reason দেওয়া যাতে পরের generation নিজের ইচ্ছেতেই সেটাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যায়।

প্রশ্ন: বিভিন্ন পশু-পাখিদের জন্য কাজ করার শুরুটা কীভাবে?

উত্তর: সত্যি বলতে, পশুদের প্রতি এই টানটা আমার খুব ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলার একটা routine যেন কখনও বদলায়নি—রাস্তায় কুকুর-বিড়াল দেখলেই ছুটে গিয়ে আদর করা, আর তারপর মায়ের panic—"হাত ধুয়েছিস?" সঙ্গে খানিকটা বকুনি!

পাড়ায় কোনও puppy দেখলে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা, স্নান করানো, খাওয়ানো—তারপর tuition থেকে ফিরে এসে জানতে পারতাম, মা কাউকে দিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলায় আমার কাছে পশুদের ভালোবাসা মানে ছিল

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রোজকার রান্নায় থাকুক স্বাদের নিশ্চয়তা!

পরিবারের প্রতিটি প্রিয় পদে ভরসা রাখুন শালিমার সয়াবিন তেল-এ..



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON



মূলত এইটুকুই—আদর করা, খেতে দেওয়া, কাছে টেনে নেওয়া।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে pet রাখা একেবারেই ‘no-no’ ছিল। কিন্তু lockdown হওয়ার ঠিক তিন দিন আগে খবর পেলাম, এক পরিচিতের pet dog-এর বাচ্চা হয়েছে এবং বাচ্চাগুলোকে অন্য কোথাও দিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকেই Noddy-কে—আমার ছেলেকে—বাড়িতে নিয়ে আসি।

আর Noddy-ই বোধহয় আমাকে প্রথম শেখাল, একটা প্রাণীকে ভালোবাসা আর তার দায়িত্ব নেওয়া—দুটো এক জিনিস নয়।

ওকে আদর করা বা খেতে দেওয়ার বাইরে pet parenting-এর প্রায় কোনও বিষয়েই তখন আমরা educated ছিলাম না। তার উপর lockdown—vet কোথায় পাব, emergency হলে কোথায় যাব, কীভাবে treatment করাব—কিছুই জানতাম না। Internet ঘেঁটে ঘেঁটে সব শিখতে শুরু করলাম। তারপর Noddy-র parvo হল।

সেই সময়টা আমার জীবনের একটা বড় reality check। পাগলের মতো doctor, hospital, treatment খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমনকি Amphan-এর দিনও Noddy-কে saline দিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ঝড়ের জন্য সেদিন সারারাত আমরা বাইরে আটকে ছিলাম; পরের দিন বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম।

কিন্তু ওই অভিজ্ঞতাটাই আমার ভাবনার জায়গাটা সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

মনে হয়েছিল—বাড়ির একটা পোষ্য, যার জন্য আমরা দু’জন মানুষ সমস্ত শক্তি দিয়ে doctor, hospital, medicine খুঁজছি, তারই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে রাস্তায় পড়ে থাকা সেই প্রাণীগুলোর কী হয়, যাদের খেয়াল রাখার মতো কেউ নেই?

আর তখন তো lockdown। মানুষের দোকানপাট, হোটেল, বাজার—সব বন্ধ। তার সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাস্তার অসংখ্য কুকুর-বিড়ালের খাবারের উৎসও।

এরপর ধীরে ধীরে animal welfare-এর সঙ্গে যুক্ত মানুষদের community-তে যোগ দিই। Rescue, treatment—এই কাজগুলোর সঙ্গে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতিটি উৎসবে
স্বাস্থ্যকর জীবনের সঙ্গী...

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যোগ করুন
দ্য ফ্রি ফার্মের প্রিমিয়াম সিডস্।



www.thefreefarm.co.in Follow us on | Available in

সরাসরি যুক্ত হতে শুরু করি। অনেক সময় ওদের অবস্থা দেখে সত্যিই কান্না পেত। যত ভিতরে ঢুকছিলাম, তত বুঝছিলাম সমস্যাটা শুধু কয়েকটা প্রাণীকে খাওয়ানো নয়—প্রয়োজন একটা স্থায়ী আশ্রয়ের, চিকিৎসার, এবং এমন একটা জায়গার যেখানে অসুস্থ বা পরিত্যক্ত হয়ে গেলেও একটা প্রাণীর জীবনের মূল্য শেষ হয়ে যাবে না।
আমার আর আমার husband-এর একটা জমি ছিল। সেখানে আমাদের আসলে একটা artist residency তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল।
তারপর একদিন হঠাৎ একটা ফোন এল।
একটি জায়গায় প্রায় ১৫টি paralysed বাচ্চা থাকত। জায়গাটি অন্য কাজে ব্যবহার করা হবে বলে ওদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে ছেলেটি ওদের দেখাশোনা করত, সে ফোনে কাঁদছিল। ওদের কয়েকজনের rescue ও treatment-এর সঙ্গে আমিও আগে থেকেই যুক্ত ছিলাম। কিন্তু এবার প্রশ্নটা ছিল—ওদের নিয়ে যাওয়া হবে কোথায়?
সেই মুহূর্তে আর খুব বেশি হিসেব করিনি।
যে জমিতে artist residency হওয়ার কথা ছিল, প্রায় overnight সেই জমিতেই ওদের নিয়ে এলাম।
আর সেখান থেকেই শুরু হল Animal Kingdom Shelter।
তাই আমার কাছে Animal Kingdom কোনও পরিকল্পনা করে শুরু করা project নয়। এটা তৈরি হয়েছিল একটার পর একটা অভিজ্ঞতা, অসহায়তা আর দায়িত্ববোধ থেকে। Noddy আমাকে প্রথম সেই দায়িত্বটা বুঝিয়েছিল, আর ওই ১৫টা প্রাণী সেই দায়িত্বকে একটা স্থায়ী ঠিকানা দিয়েছিল।
আজ পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, আমরা হয়তো জমিটা অন্য একটা স্বপ্নের জন্য রেখেছিলাম—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে এমন একটা স্বপ্ন তৈরি হল, যেখানে কথা বলতে না-পারা অনেকগুলো প্রাণীরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

প্রশ্ন: এমন কোনও উদ্ধারকাহিনি আছে যা আজও আপনার মনে দাগ কেটে আছে?

উত্তর: অনেক আছে। কিন্তু যদি দু'টি নাম বলতে হয়, আমি বলব—দুর্গা আর জয়ী।
দুর্গাকে যখন আমরা পাই, ওর মুখের মধ্যে chocolate bomb ঢুকিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছিল কিছু অমানুষ। প্রথমবার ওকে দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মুখ বলে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, নাকটাও নেই। জিভটা শুধু মুখের বাইরে ঝুলে থাকে।
তখন মনে হয়েছিল—ও বাঁচবে কীভাবে? খাবে কীভাবে? কিন্তু আমরা হয়তো দুর্গার জীবনীশক্তিকে underestimate করেছিলাম।
আজ প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। ওই অবস্থাতেই ও খায়, বাঁচে, নিজের মতো করে জীবনকে উপভোগ করে। ওকে দেখলে আমার বারবার মনে হয়—আমরা মানুষরা কত ছোট ছোট সমস্যায় ভেঙে পড়ি, আর এই মেয়েটা এতটা যন্ত্রণা, এত বড় একটা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কী অসম্ভব জেদে জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছে!
তাই দুর্গার গল্পটা আমার কাছে শুধু মানুষের নিষ্ঠুরতার গল্প নয়। তার থেকেও অনেক বেশি, একটা প্রাণীর বেঁচে থাকার ইচ্ছার গল্প।
আরেকটা ঘটনা হল জয়ী।
জয়ী তখন pregnant। দীপাবলির ঠিক আগের দিন, Nungi station-এ বাজির শব্দে ভয় পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়তে গিয়ে ট্রেনের নীচে পড়ে ওর তিনটে পা প্রায় সম্পূর্ণ কেটে যায়।
ওকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল ওর গর্ভের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো C-section করে বাচ্চাগুলোকে বের করতে হবে। এত বড় trauma, এত রক্তক্ষরণ, তিনটে পা হারানো—এর পরে ওর পক্ষে আর কী-ই বা সম্ভব?
কিন্তু জয়ী আবার আমাদের ভুল প্রমাণ করল।
ও নিজের চেষ্টায় normal delivery করল। চারটে বাচ্চার জন্ম দিল।
শুধু তাই নয়—অন্য একটি মা মারা যাওয়ার পরে তার আরও তিনটি বাচ্চাকেও নিজের দুধ খাইয়ে বড় করেছে জয়ী।
মানে, নিজের তিনটে পা নেই, নিজের শরীর তখনও একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে সেরে ওঠার লড়াই করছে, তার মধ্যেও নিজের চারটে আর অন্য মায়ের তিনটে—মোট সাতটা বাচ্চাকে আগলে রেখেছে।
ওকে দেখে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল—মানুষ হয়ে হয়তো এতটা করা যায় না।
আমরা নিজেদের খুব superior species ভাবি। কিন্তু দুর্গা আর জয়ীর মতো প্রাণীদের দেখে বারবার মনে হয়, resilience, motherhood, compassion—এই

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

উৎসবের প্রতিটি রান্নায় খাঁটি ভালোবাসা!



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON



শব্দগুলোর আসল অর্থ কখনও কখনও ওরাই আমাদের শেখায়।
দুর্গা আমাকে শিখিয়েছে, শরীর ভেঙে গেলেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা শেষ হয়ে যায় না।
আর জয়ী আমাকে শিখিয়েছে, নিজের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও অন্য একটা প্রাণের দায়িত্ব নেওয়া যায়।
তাই অনেক সময় মনে হয়, আমরা ওদের rescue করি—এটা পুরো সত্যি নয়।
ওদের চিকিৎসা আমরা করি, আশ্রয় আমরা দিই; কিন্তু জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় শিক্ষাগুলো অনেক সময় ওরাই আমাদের দিয়ে যায়।
আজও দুর্গাকে খেতে দেখলে বা জয়ীর গল্প মনে পড়লে মনে হয়—জীবন শরীরের পূর্ণতায় নয়; জীবন বেঁচে থাকার ইচ্ছে, ভালোবাসা আর অন্যের জন্য বাঁচতে পারার ক্ষমতায়।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে আপনার লেখা বা গবেষণার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে কী পৌঁছে দিতে চান?

উত্তর: ভবিষ্যতে আমার গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয় করতে চাই নাট্যশাস্ত্র এবং ভারতীয় পরিবেশনশিল্প-সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে। আমার আগ্রহ শুধু নৃত্য বা নাট্যের ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এই শাস্ত্রগুলিতে নিহিত বহুমাত্রিক জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে গভীরভাবে অনুধাবন করা, সমকালীন জ্ঞানের আলোয় তার প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধান করা এবং সেই উপলব্ধিকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।
এই আগ্রহের পিছনে আমার নিজের শিক্ষাজীবনেরও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। আমি নিজে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন-এর ছাত্রী। একদিকে বিজ্ঞান, অন্যদিকে নৃত্য—দুই ধারার শিক্ষাই আমার ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। সম্ভবত সেই কারণেই শিল্পকে আমি কখনও শুধু তার বাহ্যিক সৌন্দর্য বা বিনোদনের দিক থেকে দেখতে পারিনি। আমার মনে বারবার প্রশ্ন এসেছে—একটি ছন্দ কেন আমাদের শরীর ও মনকে প্রভাবিত করে? শব্দ, কম্পন, গতি ও আবেগের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়? একটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা অভিব্যক্তি কীভাবে দর্শকের মনে একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করে?

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতিটি পদে রং, গন্ধ আর স্বাদের পরিপূর্ণতা মানেই শালিমার শেফ মশলা..



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON

নাট্যশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, সেখানে শরীর, মন, আবেগ, প্রকৃতি, নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জায়গাটিই আমার গবেষণার আগ্রহকে আরও গভীর করেছে।

যেমন, রস ও ভাবের তত্ত্বে মানুষের আবেগ ও মনস্তত্ত্বের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে। আবার শরীরের ভঙ্গি, শ্বাসপ্রশ্বাস, গতি, যোগ ও অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে শারীরবিদ্যা, দেহচর্চা এবং চিকিৎসামূলক প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়েও গবেষণার বিস্তর সুযোগ রয়েছে।

আমার ইলেকট্রনিক্সের শিক্ষার কারণে শব্দ, কম্পাঙ্ক, কম্পন, শক্তি, চৌম্বক ও তড়িৎচৌম্বকীয় শক্তি—এই বিষয়গুলিও স্বাভাবিকভাবেই আমাকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতি, মানবদেহ এবং আমাদের প্রাচীন শিল্পচর্চায় শব্দ, কম্পন বা শক্তি সম্পর্কে যে ধারণাগুলি রয়েছে, সেগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় কতটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কোথায় তাদের মধ্যে বাস্তব সংযোগ রয়েছে এবং কোথায় আরও পরীক্ষানির্ভর গবেষণার প্রয়োজন—সেটা অনুসন্ধান করতে চাই।

এর পাশাপাশি আমার আগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন। সৌন্দর্যকে আমরা কীভাবে অনুভব করি? একটি শিল্পকর্ম কীভাবে দর্শকের মধ্যে বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেয়? শিল্পীর প্রকাশ কীভাবে দর্শকের মনে রসের সঞ্চার ঘটায়? আমার কাছে এগুলি শুধু শিল্পের প্রশ্ন নয়, মানুষের মন ও চেতনাকে বোঝারও প্রশ্ন।

তবে প্রাচীন বলেই কোনও ধারণাকে বিনা প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি চাই, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, স্নায়ুবিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোয় নতুন করে দেখা হোক। কোথায় বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র রয়েছে, কোথায় দর্শন বা রূপক রয়েছে এবং কোন বিষয়গুলি আরও গবেষণার দাবি রাখে—এই পার্থক্যটিও স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

এর পিছনে আমার একটি ব্যক্তিগত তাগিদও রয়েছে। আমি নিজে বিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় শিল্প—দুই ধারার শিক্ষার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি। অথচ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুই ক্ষেত্রকে প্রায়শই সম্পূর্ণ আলাদা দুটি জগৎ হিসেবে দেখা হয়। আমার নিজের যাত্রা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে—শিল্পের শিক্ষার্থী কেন বিজ্ঞানের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবে না? আবার বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীই বা কেন নন্দনতত্ত্ব, দর্শন কিংবা রস-ভাবের মতো ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে না?

এই কারণেই আমার দীর্ঘমেয়াদি ইচ্ছা, এই জ্ঞান শুধু গবেষণাগার, বিশ্ববিদ্যালয় বা শাস্ত্রীয় শিল্পের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় শিক্ষাক্রমে বয়সোপযোগী ও আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হোক।

একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকেই শিল্পের মাধ্যমে নিজের শরীর ও মনকে বুঝতে শেখে, নিজের আবেগকে চিনতে শেখে, ছন্দ ও গতিকে অনুভব করে, প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক উপলব্ধি করে এবং নন্দনতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়—একই সঙ্গে যদি প্রশ্ন করতে ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তার উত্তর খুঁজতে শেখে—তাহলে শিক্ষা আরও সামগ্রিক হয়ে উঠতে পারে।

আমার কাছে ঐতিহ্যকে সম্মান করার অর্থ শুধু তাকে সংরক্ষণ করা নয়; তাকে প্রশ্ন করা, গবেষণা করা এবং সময়ের আলোয় নতুন করে আবিষ্কার করা।

আমার লেখা ও গবেষণার মাধ্যমে যদি বিজ্ঞান ও শিল্প, প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক অনুসন্ধান, ঐতিহ্য ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে পারি, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে।

প্রশ্ন: একজন নারীর নিজের স্বপ্ন এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা কতটা জরুরি?

উত্তর: আমার কাছে নিজের স্বপ্ন আর পরিবার—এই দুটো আসলে একই মুদ্রার দুই পিঠ। আমি কখনও মনে করি না যে পরিবারকে বেছে নিলে নিজের স্বপ্নকে ছেড়ে দিতে হবে, অথবা নিজের স্বপ্নের পিছনে ছুটলে পরিবার পিছনে পড়ে থাকবে। বরং দুটো মিলিয়েই আমার জীবনটা সম্পূর্ণ।

আমি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি, আমরা প্রত্যেকে এই জীবনটা শুধু নিজের জন্য পাইনি। প্রত্যেকেরই কোনও না কোনওভাবে পৃথিবীর প্রতি কিছু দায় আছে, কিছু দেওয়ার আছে। আমার কাছে জীবন মানে শুধু জন্ম নেওয়া, নিজের সংসার তৈরি করা, খাওয়া-ঘুমোনো, নিজের প্রয়োজন ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটিয়ে একদিন চলে যাওয়া নয়। শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে নিয়ে আসাটাই আমার কাছে জীবনের একমাত্র সার্থকতা হতে পারে না; বরং তাদের জন্য কেমন একটা পৃথিবী রেখে যাচ্ছি, এবং কেমন মানুষ হিসেবে তাদের তৈরি করে যাচ্ছি—সেটাও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হোটেল পুলিনপুরী (পুরী)





Hotel Pulin Puri (Puri)

SWARGADWAR, PURI-752001, ODISHA
Ph : (06752) 222 360, 220 700
Fax : (06752) 221 700
mail : hotelpulinpuri@yahoo.com
Online Booking : www.hotelpulinpuri.com

হোটেল নিউ সি-হক (পুরী)



HOTEL NEW SEA HAWK(PURI)

NEW MARINE DRIVE, SWARGADWAR,
PURI-752001, ODISHA
Email : hotelnewseahawk@yahoo.co.in
Ph : (06752) 231 500, 231 400, Fax : 230 268
Online Booking : www.hotelnewseahawk.com

We Have No Connection With
Hotel Sea Hawk (Digha)

Kolkata Booking :
48A, Dr. Sundari Mohan Avenue
, 1st floor (Opp.Ladies Park),
Kolkata - 700014
Ph : (033) 2289 7578
9007857627, 9831289141.



সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আমার সন্তান, আমার পরিবার যেমন আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তেমনই আমার শিল্প, আমার ছাত্রছাত্রী, আমার কাজ এবং যে প্রাণীগুলোর দায়িত্ব আমরা নিয়েছি—এরাও আমার জীবনের উদ্দেশ্যের অংশ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে আমি দেখি না।

বরং মাতৃত্ব ও সংসার আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে—ধৈর্য, দায়িত্ব, সময়ের মূল্য, অগ্রাধিকার ঠিক করা। আবার আমার নিজের স্বপ্ন ও কাজ আমাকে আমার ব্যক্তিসত্তাটা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

এবং এখানেই আমার আরও একটা স্বপ্ন আছে। আমি শুধু নিজে কিছু করতে চাই না, আমার সন্তানদের, আমার ছাত্রছাত্রীদের এবং আমার চারপাশের মানুষদের মধ্যেও সেই ইচ্ছেটা তৈরি করতে চাই। তারা প্রত্যেকে হয়তো আমার মতো কাজ করবে না, করার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তারা যেন নিজেদের মতো করে প্রশ্ন করে—আমি যে পৃথিবীতে এত কিছু পাচ্ছি, সেই পৃথিবীকে আমি কী ফিরিয়ে দিচ্ছি?

আমি চাই আমার সন্তানরা আমাকে দেখে বুঝুক যে পরিবারকে ভালোবাসা এবং নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা পরস্পরবিরোধী নয়। একজন মা বা বাবা হওয়ার পরেও নিজের পরিচয়, নিজের স্বপ্ন এবং সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব থাকতে পারে। একইভাবে আমার ছাত্রছাত্রীরা যেন শিল্পকে শুধু মঞ্চে ভালো নাচ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখে; শিল্প তাদের আরও সংবেদনশীল, দায়িত্বশীল ও সহমর্মী মানুষ হয়ে উঠতেও সাহায্য করুক।

তাই আমার কাছে ‘balance’ মানে প্রতিদিন সবকিছুকে সমান সময় দেওয়া নয়। সেটা বাস্তবে সম্ভবও নয়। কোনও দিন পরিবারের প্রয়োজন বেশি, কোনও দিন কাজের। Balance আমার কাছে সময়ের সমান ভাগ নয়, জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য।

শেষ পর্যন্ত আমার চাওয়া খুব সহজ—আমি যেদিন এই পৃথিবী থেকে চলে যাব, সেদিন যেন মনে হয়, শুধু নিজের জন্য বেঁচে যাইনি। আমার উপস্থিতির কারণে অন্তত কিছু মানুষের, কিছু ছাত্রছাত্রীর, কিছু

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



To order homefood call at

62899 09399

Available on

zomato

Download App

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Visit us at : www.nanighar.net

প্রাণীর জীবন হয়তো সামান্য হলেও সুন্দর হয়েছে। আর তার থেকেও বড় প্রাপ্তি হবে যদি আমার সন্তান বা আমার কোনও ছাত্রছাত্রী একদিন অন্য কারও জীবনকে একটু সুন্দর করে তোলে—এবং তার থেকে আবার আর একজন অনুপ্রাণিত হয়। কারণ আমার কাছে সত্যিকারের পরিবর্তন তখনই আসে, যখন একটি ভালো কাজ শুধু একজনের মধ্যে থেমে থাকে না; একজন থেকে আর একজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি পৃথিবীটাকে একা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারব না। কিন্তু আমার কাজ, আমার সন্তান, আমার ছাত্রছাত্রী এবং আমার চারপাশের মানুষদের মাধ্যমে যদি সেই ভাবনাটুকু ছড়িয়ে দিতে পারি—পৃথিবী থেকে শুধু নেওয়া নয়, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু ফিরিয়েও দিয়ে যেতে হয়—তাহলেই আমার কাছে জীবনটা সত্যিই অর্থপূর্ণ।

প্রশ্ন: সাফল্য মানে আপনার কাছে কী? মঞ্চের করতালি, ব্যবসার সাফল্য নাকি নিজের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখা?

উত্তর: আমার কাছে সাফল্যের সংজ্ঞাটা হয়তো একটু অন্যরকম। সাফল্যকে আমি শুধু পুরস্কার, পরিচিতি, অর্থ বা কত বড় মঞ্চে পৌঁছলাম—এই মাপকাঠিতে দেখি না। আমার কাছে সাফল্যের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হল—আমার কাজের কারণে আর একজন মানুষের ভাবনায় বা জীবনে কতটুকু ইতিবাচক পরিবর্তন এল।

আমি যদি অন্তত একজন মানুষকেও আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করাতে পারি, সেটাও আমার কাছে সাফল্য। আমার কোনও একজন ছাত্রছাত্রী যদি ভারতীয় পরিবেশনশিল্পের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও উত্তরাধিকারের কথা জানতে চায়, তাকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চায়—তাহলে একজন শিল্পী ও শিক্ষক হিসেবে আমার কাজের একটা উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

একইভাবে আমার কাজের আরেকটি ক্ষেত্র হল sustainable বা পরিবেশ-সচেতন জীবনযাপন। আমার কোনও একজন ক্রেতাও যদি আমার কাজের মাধ্যমে এমন বস্ত্র বেছে নিতে উৎসাহিত হন, যা তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব, ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমায় এবং ব্যবহারের পরে দীর্ঘদিন ধরে বর্জ্যের বোঝা হয়ে না থাকে—সেটাও আমার কাছে সাফল্য। কারণ আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীকে বদলানোর কথা বলার পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলিকেও সেই ভাবনার অংশ করতে হবে।

Animal welfare-এর ক্ষেত্রেও আমার ভাবনাটা একই। যে প্রাণীরা নিজেদের কষ্ট বা প্রয়োজন আমাদের ভাষায় বলতে পারে না, তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং আরও একজন মানুষকে তাদের প্রতি সহমর্মী ও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করা—আমার কাছে সেটাও সাফল্য।

আমার কাছে সাফল্য মানে তাই সবসময় বিশাল কোনও পরিবর্তন ঘটানো নয়। একজন মানুষকে সচেতন করা, একটি প্রাণীর জীবন বাঁচানো, একটি পরিবেশ-সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে কাউকে উৎসাহ দেওয়া—এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলিই একসময় বড় পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরি করে।

আর একজন শিল্পী হিসেবে সাফল্যের আরও একটি খুব ব্যক্তিগত সংজ্ঞা আছে আমার।

একটি অনুষ্ঠান শেষে দর্শক যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যান, আমি চাই তাঁরা যেন শুধু মনে না রাখেন যে তাঁরা একটি ভালো নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছেন। তাঁরা যেন সঙ্গে করে একটি অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফেরেন—হয়তো আনন্দ, শান্তি, কোনও প্রশ্ন, কোনও উপলব্ধি, অথবা নিজের সংস্কৃতিকে নতুন করে জানার ইচ্ছা।

আমার কাছে শিল্পের সার্থকতা সেখানেই—মঞ্চে যা সৃষ্টি হল, তা যদি মঞ্চেই শেষ না হয়ে দর্শকের মনের মধ্যে আরও কিছুটা পথ চলতে পারে।

তাই আমার কাছে সাফল্য কোনও একটি গন্তব্য নয়। আমার শিল্প, শিক্ষা, পরিবেশ-সচেতন কাজ কিংবা প্রাণীদের জন্য কাজ—সবকিছুর মধ্যেই মূল উদ্দেশ্য এক: নিজের উপস্থিতির মাধ্যমে পৃথিবীটাকে যতটুকু সম্ভব আরও সংবেদনশীল, সচেতন এবং বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়া।

আর যদি আমার কাজ দেখে আরও একজন মানুষ একইভাবে অন্য কারও জন্য কিছু করতে অনুপ্রাণিত হন, তাহলে সেটাই হয়তো আমার কাছে সাফল্যের সবচেয়ে সুন্দর রূপ।

প্রশ্ন: দুর্গাপুজোর সময়ে আমরা দেবীকে দশভূজা রূপে দেখি। আপনার কাছে একজন আধুনিক নারীর "দশভূজা" হয়ে ওঠার অর্থ কী?

উত্তর: আমার কাছে দশভুজা মানে একজন শক্তিশালী নারী—আর সেই শক্তি শুধু দশ হাতে দশটা কাজ সামলে নেওয়ার ক্ষমতা নয়। সেই শক্তি সৃষ্টি করার, লালন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এক কাপ চায়ে জমুক উৎসবের গল্প!

আড্ডা, আনন্দ আর প্রিয়জনের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত,
সবকিছুর সঙ্গী শালিমার টেস্টি কাপ।



Shalimar®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON

করার, রক্ষা করার এবং প্রয়োজন হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর।

মাতৃত্বও আমার কাছে শুধু একটি প্রাণকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা নয়; তাকে সুন্দর পথ দেখানো, মূল্যবোধ দেওয়া এবং তার জন্য আরও সুন্দর একটি পৃথিবী রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা।

মা দুর্গার রূপটা আমাকে সেই কারণেই খুব অনুপ্রাণিত করে। অপরূপ সৌন্দর্যে সজ্জিত একজন নারী, দশ হাতে অস্ত্র নিয়ে একাই মহিষাসুরকে বধ করছেন। এই দৃশ্যটা যেন মনে করিয়ে দেয়—নারীত্ব ও শক্তি পরস্পরের বিপরীত নয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও হয়তো অন্যায়, ভয়, অজ্ঞতা বা নিষ্ঠুরতার মতো ছোট-বড় 'মহিষাসুর' আছে। আমরা দেবী নই, কিন্তু নিজের ছোট্ট পরিসরে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি আমাদেরও আছে।

আর বাঙালি হিসেবে দুর্গার যে রূপ দেখে আমরা বড় হয়েছি, সেখানে আরেকটি বিষয় আমাকে খুব আকর্ষণ করে। মূর্তিতত্ত্ব শাস্ত্র ও অঞ্চলভেদে আলাদা হতে পারে, কিন্তু বাংলার পরিচিত দুর্গাপ্রতিমায় তিনি একা নন—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে নিয়ে পুরো পরিবার তাঁর সঙ্গে। আমার কাছে এই ছবিটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে তিনি মহিষাসুরমর্দিনী, অন্যদিকে তিনি মা। নিজের শক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তাঁর পরিবার ছবির বাইরে চলে যায়নি; আবার মাতৃত্বও তাঁর শক্তিকে আড়াল করেনি। এটা আমার নিজের জীবনের দর্শনের সঙ্গেও মিলে যায়। আমার কাছে পরিবার আর নিজের স্বপ্ন দুটি বিপরীত বিষয় নয়। আমি মা হতে পারি, আবার শিল্পীও হতে পারি; পরিবারকে আগলে রাখতে পারি, আবার নিজের বিশ্বাস ও স্বপ্নের জন্য কাজও করতে পারি।

তাই আমার কাছে দশভুজা হওয়া মানে সবকিছু একা সামলে নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া নয়। বরং নিজের ভিতরের শক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে তা অন্যকেও শক্তি দেয়, রক্ষা করে এবং চারপাশের পৃথিবীটাকে একটু সুন্দর করে।

সেই শক্তি, যা নিজের মধ্যে আটকে না থেকে পরিবার, সমাজ, প্রাণী ও প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে—আমার কাছে সেটাই দশভুজার প্রকৃত অর্থ।

প্রশ্ন: এই পুজোয় যদি দেবীর কাছে নিজের জন্য মাত্র একটি আশীর্বাদ চাইতে পারেন, কী চাইবেন?

উত্তর: প্রথমে নিজের জন্য চাইব—আরও শক্তি, সাহস আর সামর্থ্য। এখনও যে স্বপ্নগুলো পূরণ হয়নি, সেগুলো বাস্তব করার এবং যে কাজগুলো করতে চাই, সেগুলো সম্পূর্ণ করার শক্তি যেন পাই।

একজন শিল্পী হিসেবে আমার প্রার্থনাটা আরও ব্যক্তিগত। আমি যেন কোনওদিন আমার শিল্পের প্রতি আনন্দ, সততা আর বিস্ময়বোধ হারিয়ে না ফেলি। ঘুঙুর বাঁধার সময় আজও যে অনুভূতি হয়, মঞ্চে উঠে দর্শকের সঙ্গে যে নীরব আদান-প্রদান তৈরি হয়, তা যেন সারাজীবন আমার মধ্যে অটুট থাকে। আমার নাচ শুধু একটি সুন্দর পরিবেশনা হয়ে শেষ না হয়ে, কারও মনে যদি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বা নিজের শিকড়কে নতুন করে দেখার আগ্রহ জাগায়, সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

তবে নিজের জন্য চাওয়ার পর মায়ের কাছে আরও বড় একটি প্রার্থনা থাকবে—মানুষকে আরও একটু মানুষ করে দাও। তাদের মধ্যে দয়া, সহমর্মিতা আর বিবেক ফিরিয়ে দাও।

আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন চারপাশে অস্থিরতা। প্রকৃতি বিপন্ন, পৃথিবীর নানা প্রান্তে সংঘাত ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে—আমরা কেমন পৃথিবী রেখে যেতে চাই এবং একে অপরের সঙ্গে কেমন আচরণ করছি। শেষ পর্যন্ত সেটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই মায়ের কাছে পৃথি বীর জন্য শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি চাইব। প্রকৃতি সুস্থ হয়ে উঠুক, মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা বাড়ুক, আর আমরা যেন শুধু নিজের ভালো থাকার কথা না ভেবে অন্য মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির কথাও ভাবতে শিখি।

আর একেবারে ব্যক্তিগতভাবে যদি বলি, আমি চাই আমার সন্তানরা যেন একটু বেশি সহমর্মী একটা পৃথিবীতে বড় হতে পারে, আমার ছাত্রছাত্রীরা যেন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হওয়ার শিক্ষাটাও নিয়ে এগিয়ে যায়, আর যে অসহায় প্রাণীগুলোর চোখের দিকে আমি প্রতিদিন তাকাই, তাদের জন্য পৃথিবীটা যেন একটু কম নিষ্ঠুর হয়।

আমার ঘুঙুরের শব্দ, আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ, আমার ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন আর সেই অবলা প্রাণীগুলোর নিরাপত্তা—এগুলো আমার কাছে আলাদা আলাদা প্রার্থনা নয়। সব মিলিয়েই আমার পৃথিবী।

তাই মায়ের কাছে শেষ পর্যন্ত একটাই আশীর্বাদ চাইব—আমাকে এতটা শক্তি দিও, মা, যেন শুধু নিজের স্বপ্নগুলো পূরণ করতে না , আমার এই ছোট্ট পৃথিবীটাকেও একটু ভালো রেখে যেতে পারি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

উৎসবের আলোয় ত্বকেও থাকুক কোমলতার ঝলক!

প্রতিদিনের ত্বকের যত্নে
শালিমার ময়েশ্চারাইজিং বডি অয়েল..



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON

আগমনী ১৪৩৩

প্রবন্ধ ১

ছেলেবেলার বা যৌবনের দুর্গাপুজো: তখন পুজোর আনন্দ ছিল অনাবিল



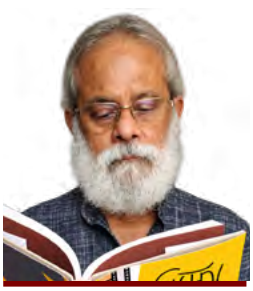

কমলেন্দু সরকার

ছোটবেলায় দুর্গাপুজো একেবারে সেই সনৎ সিংহের গানের মতো-- এক এককে এক, দুই এককে দুই, ছেলেরা সব নামতা পড়ে পাঠশালার ওই ঘরে, নন্দীবাড়ির আটচালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে, মন বসে কি আর...

তবে আমাদের পাঠশালাও ছিল না, ধারেকাছে নন্দীবাড়ির আটচালাও ছিল না, ছিল পুরনো একটি বাড়ির নীচতলা। যা বিখ্যাত টেম্পল হাউস নামে। সেই বাড়ির চাতালে দুলাল পাল নামে কুমোর দুর্গা ঠাকুর গড়তেন। অপূর্ব সব মূর্তি। পুজো শুরুর অনেক আগে থেকেই অনেকেই ঠাকুর দেখে বায়না করে যেতেন। আশপাশের বহু বারোয়ারি আর কুমোরটুলি থেকে দুর্গাপ্রতিমা আনতে যেতেন না। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কানু পাল আর এক শিল্পী প্রতিমা গড়তেন। তাঁর খুব নাম ছিল। তিনি শুধু ঠাকুর গড়ার কারিগর ছিলেন না, ছিলেন ভাস্কর্য সৃষ্টির কারিগরও।

আমাদের কাজ ছিল কাঠামো বাঁধা থেকে শুরু করে খড় বেঁধে ঠাকুরের শরীর গড়া, তারপর একমেটে দোমেটে, রং দেওয়া, চোখ আঁকা থেকে একেবারে পুজো মণ্ডপে প্রতিমা যাওয়া পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরি করা নাকি নজরদারি চালানো ছিল কাজ। পুজোর বেশকিছু দিন আগে থেকেই পড়াশোনা প্রায় লাটেই উঠত। এরজন্য প্রচুর ঠ্যাঙানিও খেতে হত বাড়িতে। একবার হল কি, পড়তে বসেছি পড়তে পড়তে হঠাৎ খেয়াল হল আমি জলে ডুবে যাচ্ছি। দম আটকে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মেথি, জুঁই ও নারকেলের যত্নে চুল হোক সুন্দর, প্রাণবন্ত!

ব্যবহার করুন শালিমার জ্যাসমিন হেয়ার অয়েল..



Shalimar's®

www.shalimars.com

FOLLOW US ON

আসছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। কথা বলতে পারছি না। গলা দিয়ে গোঁগোঁ শব্দও বেরোচ্ছে না।
আসলে পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলুনি এসে গেছিল, বড়দি টেনে এনে একটি বালতির জলে মুখ-মাথা ঠুসে ধরে। যখন আর দম নিতে পারছি না, তখন ছেড়ে দেয়।
এখানেই শেষ নয়, তার পরেই চলে আড়ং ধোলাই। তবে এর জন্য প্রতিমা গড়ার কাজ দেখাতে যে ছেদ পড়েছিল তা নয়!
পুজোর ছুটির আগে স্কুল করতাম বটে কিন্তু মনে পড়ে থাকত দুলাল পাল আর কানু পালের ঠাকুর গড়ার ঘরে। প্রতিমা গড়ার কাজের প্রতি দুর্বলতা ছোটবেলা থেকেই রয়ে গেছে। এখনও যে নেই তা নয়। কানু পালের ঠাকুর গড়ার ঘর বর্তমানে অন্ধকার থাকলেও পাশেই তাঁর আত্মীয়ের ঘরে প্রতিমা তৈরির কাজ পুরোদমে চলে। মাঝেমধ্যেই ঢুঁ মারি। ছবি তুলি। বিশাল বিশাল প্রতিমার পাশে একচালার ছোট দেবী মূর্তিও গড়েন কারিগরেরা। সাংবাদিকতা করার সুবাদে একটা সময় ছিল প্রতিবছর কুমোরটুলি নিয়ে ফিচার লিখতাম। সেখানকার শিল্পীদের সুবিধা-অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি নিয়ে লিখতাম। কয়েক বছর আগেও গিয়েছি কুমোরটুলি এখনও তাঁদের একই কথা। শিল্পীদের তেমন নতুন কিছু হয়নি। এখনও বর্ষাকালে তাঁদের চরম দুর্দশা। বৃষ্টিতে ভিজে যায়। বিশাল বিশাল প্ল্যাস্টিক চাপা দেন প্রতিমায়। তবুও ভিজে যায়।
এই কুমোরটুলি একসময় এখানে ছিল না।
ছিল, গোবিন্দপুরের মাঠের একদিকে। সেইসময় গড়েরমাঠটিকে বলা হত গোবিন্দপুরের মাঠ। তখনও তো কেল্লা হয়নি, তাই গড়েরমাঠও ছিল না। ছিল গোবিন্দপুরের মাঠ। সেখানেই থাকতেন ঠাকুর গড়ার কারিগরেরা। সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পুরনো কেল্লা ভেঙে পড়লে নতুন কেল্লা তৈরি হল গোবিন্দপুরের মাঠে। সেইসময় তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঠাকুর গড়ার কারিগরেরা চলে এসে ডেরা বাঁধলেন বর্তমানের কুমোরটুলিতে।
এখন তো সাবেকি কুমোরটুলির বাইরে একাধিক কুমোরটুলি গড়ে উঠেছে।
ছোটবেলার পুজো ছেড়ে কুমোরটুলি নিয়ে পড়লাম। এ হল গল্পবলার অভ্যাস। বা বেশি কথা বলার ব্যামো। প্রতিমা গড়ার প্রতি প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও ঠাকুর দেখার প্রতি তেমন আগ্রহ থাকত। তার অর্থ এই নয় যে নতুন জামাকাপড় পরে ঠাকুর দেখতে বেরোতাম না, তা নয়। খুব বেশিদূর যেতাম না। কাছেপিঠে যেতাম। দুর্গাপ্রতিমার মতো মূর্তি আর কোনও দেবীর নেই। টানা টানা চোখ, অপূর্ব মুখশ্রী-- সবমিলিয়ে অপরূপা দেবী দুর্গা!
যখন হিমালয় যেতে শুরু করলাম তখন কালীমঠ গেছিলাম। সরস্বতী গঙ্গার ধারে কালীমঠ। এখানেই নাকি দেবী দুর্গার সঙ্গে অসুরদের লড়াই হয়েছিল। অসুরবধ হয়। স্থানীয় একজন সরস্বতী গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড একটা কালো গোল পাথর দেখিয়ে বলেছিলেন, "ওই যে দেখছেন ওটা অসুরের কাটা মুন্ডু।" দেখে শিহরিত হয়েছিলাম। সবকিছু মনে বিশ্বাস নিয়ে দেখতে হয়। অবিশ্বাসী মন নিয়ে কখনও দেখতে নেই তার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। ব্যাপারটা হল, বিশ্বাস করলেই কিইবা আসে-যায়, অবিশ্বাস করলেও ঠিক তাই। অসুর নিধনের পর দেবী বিশ্রাম নিয়েছিলেন কাছেই এক পাহাড়ে। সেখানে আছে দেবীর পায়ের ছাপ! তবে, এরপর দেবী দুর্গা কালী মূর্তি ধারণ করে পাতাল প্রবেশ করেন। তাই দেবী এখানে পাতালবাসিনী। কাছেই মহাকবি কালিদাসের গ্রাম এবং বাড়ি। এখানে বসেই তিনি কাব্য রচনা করতেন। তাঁর বাড়ির উঠোন থেকে দেখা যেত কেদারপর্বত। ছিল জঙ্গলও।
দেবী দুর্গাকে ভাল লাগার কারণ তাঁর চমৎকার রূপ। তেমনই তাঁর চার পুত্র-কন্যা। সিংহ আর অসুরকেও মন্দ লাগে না। অসুরের বেশ সুপুরুষ চেহারা। ছোটবেলায় অসুরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম একদৃষ্টে। তাঁকে দুঃখও হত কমবেশি। তাঁকে কেমন অসহায় লাগত। প্রতিবছর তার একই অবস্থা। কোনও কোনও জায়গায় দেখতাম অসুরটি খুব তেড়েফুঁড়ে উঠেছে। ভাবতাম, উঠলে কী হবে সেই তো মৃত্যু লেখা আছে দেবী দুর্গার হাতে। নিস্তার নেই।
কার্তিককে কেমন ফুলবাবু ফুলবাবু লাগত, এখনও যে লাগে না তা নয়, লাগে। তবে গণেশকে বরাবরই আমার পছন্দ, এখনও। ছোটবেলায় বলতাম, গণেশদাদা পেটটি নাদা! তখন ভাবতাম গণেশ আর কাউকে পেল না, কলাগাছকে বিয়ে করল! পছন্দ বলে কিছু নেই। তখন ভাবতাম, হাতি যেমন কলাগাছ খায়, গণেশ আবার রাত্রিবেলা যখন কেউ থাকবে না নিজের বউকে আবার খেয়ে নেবে না তো! কে জানে। তাই প্রতিদিন একবার

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life



Nestlé
Milkmaid®





recipes @
www.milkmaid.in

Create Sweet Stories



করে দেখতাম গণেশদাদার পাশে একহাত ঘোমটা টানা কলাবউটি সশরীরে অবস্থান করছেন কিনা! এখনও চেষ্টা করি পুরনো দিনে ফিরে যাওয়ার। দুর্গাপুজোর মজা আলাদা। দীর্ঘদিন চলে বলে এই পুজোর ভিন্ন একটা মাত্রা আছে, মজা আছে। একবার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে গেছিলাম দুর্গাপুজো দেখতে। একেবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে আসা। বিজলিবাতি নেই গ্রামে। পুজোর ক'দিন জেনারেটরে আর হ্যাজাকের আলো জ্বলত। সে যে কী আনন্দ তা অবর্ণণীয়! শেষদিন আরও ম্যাজিক দেখাবে বলে সেবার থেকে গেছিলাম অতদিন। লক্ষ্মীপুজোর বিকাল থেকে প্রচুর বৃষ্টি। থেমে গেল পুজোর পূর্বমুহূর্তে। লক্ষ্মীপুজো তাই কেবলমাত্র হ্যাজাকের আলো। চারিপাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মেঘ কেটে গিয়ে বিশাল থালার মতো চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমার। বৃষ্টিভেজা গাছের পাতার ওপর জ্যোৎস্না পড়ে পিছলে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভাল লাগছিল নারকেল গাছের পাতা। মনে হচ্ছিল যেন রুপো জল হয়ে গলে গলে পড়ছে। গেলাম নারিকেল গাছের কাছে, দাঁড়ালাম নীচে দুইহাত পেতে। রুপো গলানো জল ধরার আকাঙ্ক্ষায়। টুপটাপ করে কয়েক ফোঁটা রুপো গলানো জল পড়ল হাতে, আরও কয়েক ফোঁটা! জিভ দিয়ে স্বাদ নিলাম জলের। অপূর্ব মিষ্টি! মনে হল কোজাগরী রাত্রে মা লক্ষ্মী তাঁর চরণামৃত পাঠালেন ক্ষীরসাগর থেকে। যৌবনের সেই স্মৃতি আজও আমার সঙ্গী, নিত্য সঙ্গী!

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON

FOR HIM AND HER

#RunwayToEveryday



Lords More

182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).

Contact for more OFFERS

8420173693

আগমনী ১৪৩৩

রান্না ১

পুজোর পাঁচদিন, পাতে পাতে উৎসব



দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধু দেবী আরাধনার পাঁচটি দিন নয়, এ যেন ঘরে ফেরার, আপনজনের সঙ্গে বসার, গল্পে-আড্ডায় সময় কাটানোর এবং অবশ্যই পেটপুজোরও এক চিরচেনা উৎসব। ঢাকের বাদ্যি, কাশফুল, শিউলির গন্ধ আর নতুন জামাকাপড়ের আনন্দের সঙ্গে বাঙালির পুজো সম্পূর্ণ হয় রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা পরিচিত সব গন্ধে। উনুনে বসনো কড়াইয়ের ঢাকনা খুলতেই কখনও ভেসে আসে ঘি-গরম মশলার সুবাস, কখনও নারকেল-গুড়ের মিষ্টি গন্ধ, আবার কখনও কষা মাংসের লোভনীয় গন্ধ।

এই সংকলনে তাই ধরা থাকল পুজোর পাঁচদিনের সেই বিচিত্র রসনা-যাত্রা। নিরামিষ থেকে আমিষ, জলখাবার থেকে জমিয়ে খাওয়া, মিষ্টি থেকে টকঝাল, চেনা বাঙালি রান্না থেকে উৎসবের বিশেষ পদ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

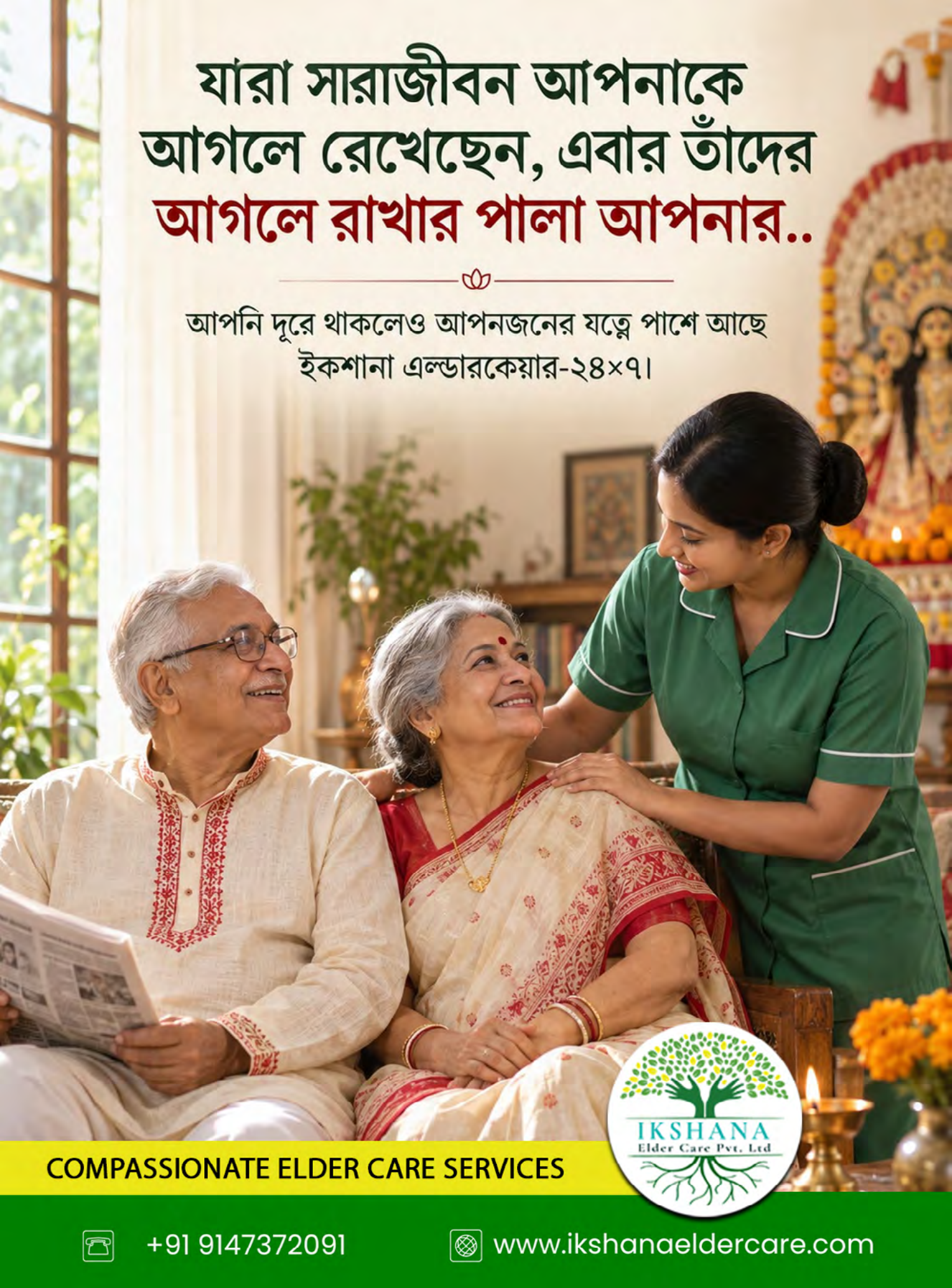
যারা সারাজীবন আপনাকে
আগলে রেখেছেন, এবার তাঁদের
আগলে রাখার পালা আপনার..
আপনি দূরে থাকলেও আপনজনের যত্নে পাশে আছে
ইকশানা এল্ডারকেয়ার-২৪×৭।
IKSHANA
Elder Care Pvt. Ltd
COMPASSIONATE ELDER CARE SERVICES
+91 9147372091
www.ikshanaeldercare.com

কুমড়ো ফুল আর ছানার কচুরি

কী কী লাগবে

ময়দা ২ কাপ, সুজি ১ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল ১ চা-চামচ, জল প্রয়োজনমতো, কুমড়ো ফুল ৮-১০টি, ছানা ২০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, কালোজিরে ১ চা-চামচ, Shalimar's হিং ১ চা-চামচ, নারকেল কোরা ২ টেবিল চামচ, ভাজা জিরের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ভাজা মৌরির গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, Shalimar's Soyabean তেল প্রয়োজনমতো



কীভাবে বানাবেন

ময়দা, সুজি, নুন ও ঘি মিশিয়ে অল্প অল্প জল দিয়ে মসৃণ মণ্ড তৈরি করে ১৫–২০ মিনিট ঢেকে রাখুন। কুমড়ো ফুলের ডাঁটি ও শক্ত অংশ বাদ দিয়ে ধুয়ে মিহি করে কেটে নিন। ঘি ও তেলে কালোজিরে ও হিং ফোড়ন দিয়ে আদা-কাঁচা লঙ্কা বাটা, কুমড়ো ফুল ও নুন দিয়ে ভাজুন। জল শুকিয়ে গেলে ছানা, নারকেল কোরা, ভাজা জিরে-মৌরি, গোলমরিচ ও চিনি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে শুকনো পুর তৈরি করুন। ঠান্ডা হলে ময়দার লেচিতে পুর ভরে বন্ধ করে আলতো হাতে বেলে নিন। মাঝারি গরম তেলে ধীরে ধীরে সোনালি করে ভেজে নিন। আলুর দম, ছোলার ডাল বা মিষ্টি কুমড়োর ছক্কার সঙ্গে পরিবেশন করুন।



মৌসুমী দাস

ষষ্ঠী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পালং শাকের ধোঁকা



কী কী লাগবে

পালং শাক ২৫০ গ্রাম, ছোলার ডাল বাটা ২০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, টমেটো বাটা ১টি, কাঁচালঙ্কা বাটা ২-৪টি, নারকেল গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা শুকনো লঙ্কা ২টি, Shalimar's হিং সামান্য, তেজপাতা ২টি, ঘি ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা সামান্য, Shalimar's সর্ষের তেল প্রয়োজনমতো, নুন স্বাদমতো

কীভাবে বানাবেন

তেলে হিং ও গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে পালং শাকের পেস্ট দিন। এরপর ছোলার ডাল বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা, নারকেল গুঁড়ো, গুঁড়ো দুধ ও নুন দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। তেল মাখানো প্লেটে মিশ্রণটি ছড়িয়ে ঠান্ডা করে টুকরো করুন। তেলে ধোকাগুলি ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা, টমেটো বাটা, জিরে-ধনে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন দিয়ে মশলা কষিয়ে সামান্য জল দিন। ঝোল ফুটে উঠলে ধোঁকা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। শেষে ঘি ও গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাদামিকা শোলা কচুর কোফতা মালাই

কী কী লাগবে

শোলা কচু ৫০০ গ্রাম, আলু ১টি, কাজুবাদাম ২ টেবিল চামচ, আমন্ড ১ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, ভাজা জিরের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, ভাজা মৌরির গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ চা-চামচ, বেসন ১-২ টেবিল চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল ভাজার জন্য

মালাইয়ের জন্য:

নারকেলের দুধ ১ কাপ, কাজুবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২টি, ঘি ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ চা-চামচ, গরম জল প্রয়োজনমতো, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ



কীভাবে বানাবেন

কচু সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে ভালো করে মেখে নিন। সেদ্ধ আলু, কাজু-আমন্ড বাটা, নারকেল, আদা, কাঁচা লঙ্কা, জিরে-মৌরির গুঁড়ো, গোলমরিচ, নুন, চিনি, বেসন ও ঘি দিয়ে মেখে ছোট ছোট বল তৈরি করুন। প্রতিটির মাঝে কাজুবাদামের টুকরো দিয়ে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এরপর ঘিতে তেজপাতা ও জিরে ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, পোস্ত বাটা ও নারকেল কোরানো কষিয়ে নারকেলের দুধ, নুন ও চিনি দিন। প্রয়োজনমতো গরম জল দিয়ে ৪–৫ মিনিট ফুটিয়ে ঘন মালাই তৈরি করুন। চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভাজা কোফতাগুলি দিয়ে ২ মিনিট হালকা আঁচে রাখুন। শেষে ঘি ও গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, পোলাও বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ত্রিবেণী জাম মাখা আমচুর পনির

কী কী লাগবে

পনির ২৫০ গ্রাম, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, পাকা কালো জাম ১ কাপ, Shalimar's Chef Spices আমচুর গুঁড়ো ১ চা-চামচ, বিট নুন ১ চা-চামচ, ভাজা জিরের গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচি ২-৩টি, লেবুর রস ১ চা-চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, কাজুবাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, নারকেলের দুধ ১/২ কাপ, টকদই ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চিমটি, ঘি ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি সামান্য, Shalimar's Soyabean তেল ভাজার জন্য



কীভাবে বানাবেন

পনিরে নুন ও গোলমরিচ মাখিয়ে অল্প তেলে হালকা সোনালি করে ভেজে রাখুন। বিচি বাদ দেওয়া জাম ভালো করে মেখে আমচুর, বিট নুন, চিনি, ভাজা জিরে, কাঁচা লঙ্কা ও লেবুর রস মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। ঘিয়ে আদা বাটা ও কাজুবাদাম বাটা কষিয়ে ফেটানো টক দই দিন। এরপর নারকেলের দুধ, নুন, সামান্য চিনি ও আমচুর দিয়ে ২–৩ মিনিট রান্না করুন। ভাজা পনির দিয়ে জামের পেস্ট ও গরম মশলা মিশিয়ে হালকা হাতে নেড়ে নামিয়ে নিন। বেশি নাড়বেন না, তাহলে জামের সুন্দর রঙের বৈপরীত্য বজায় থাকবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কাজু কুঞ্জে ছানার অমৃত কলস

কী কী লাগবে

আটা ১/২ কাপ, সুজি ২ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, দুধ ১ কাপ, এলাচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, জাফরান ৮-১০টি রেশমি, কাজুবাদাম কুচি ১ টেবিল চামচ, আমন্ড কুচি ১ টেবিল চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি ১ চা-চামচ, গ্রেট করা ছানা ২৫০ গ্রাম, চিনির রস ১/২ কাপ, মাটির কলস ২টি



কীভাবে বানাবেন

গরম দুধে সুজি ভিজিয়ে রাখুন। ঘি তে কাজু-আমন্ড ভেজে তুলে রেখে একই কড়াইয়ে গ্রেট করা ছানা হালকা ভেজে নিন। আবার সামান্য ঘি দিয়ে আটা ভেজে তাতে দুধে ভেজানো সুজি দিন। এবার চিনির রস, এলাচ গুঁড়ো ও গরম দুধে ভেজানো জাফরান দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হলে ভাজা বাদাম মিশিয়ে নামিয়ে নিন। মাটির কলসে ঢেলে উপর থেকে গোলাপের পাপড়ি ও বাদাম কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

রুই মাছের কাবাব

কী কী লাগবে

রুই মাছ ৪ পিস, গন্ধরাজ লেবু অর্ধেক টি, আলু ২টি, ব্রেড ১ স্লাইস, পেঁয়াজ কুচি ১টি, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো



কীভাবে বানাবেন

গন্ধরাজ লেবুর টুকরো ও সামান্য নুন দিয়ে রুই মাছ অল্প জলেতে সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। সিদ্ধ আলু ও ব্রেডের সঙ্গে মাছ ভালো করে মেখে রাখুন। প্যানে সামান্য তেলে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন-কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ ও নুন দিয়ে অল্প জল দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। মাছের মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে গরম মশলা ও ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। পছন্দমতো আকারে গড়ে কম তেলে দু'পিঠ সোনালি করে প্যান-সেঁকে নিলেই তৈরি রুই মাছের কাবাব।



সুতপা বৈদ্য

সপ্তমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

পমফ্রেট ফ্রাই

কী কী লাগবে

পমফ্রেট ৪ টুকরো, লেবু ১টি, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, সুজি ১/২ কাপ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল ভাজার জন্য



কীভাবে বানাবেন

মাছে লেবুর রস ও সামান্য নুন মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে নিন। এরপর আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতার পেস্টের সঙ্গে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ ও নুন মিশিয়ে মাছ ম্যারিনেট করে রাখুন। শুকনো সুজিতে মাছের টুকরোগুলি ভালো করে কোট করে নিন। অল্প তেলে কম আঁচে দু'পিঠ ধীরে ধীরে সোনালি ও মুচমুচে করে ভেজে নিন। লেবু ও কাঁচা পেঁয়াজের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মালাই পনির

কী কী লাগবে

পনির ২৫০ গ্রাম, আলু ১টি, টমেটো ২টি, কাজুবাদাম ২ টেবিল চামচ, পেস্তা ১ টেবিল চামচ, আদা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২টি, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা গরম মশলা ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ ১/২ চা-চামচ, কাসুরি মেথি ১ চা-চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো



কীভাবে বানাবেন

আদা, কাঁচা লঙ্কা, কাজু, পেস্তা, জিরে-ধনে গুঁড়ো, টমেটো, গোটা গরম মশলা ও সামান্য আলু সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইয়ে আলু ও পনির হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে মশলার পেস্ট, নুন ও হলুদ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার আলু ও প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ফুটতে দিন। ঝোল ফুটে এলে পনির দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। শেষে কসুরি মেথি ও ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাটার চিকেন

কী কী লাগবে

বোনলেস চিকেন ৫০০ গ্রাম, টকদই ৩ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ২ চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টি, টমেটো ২টি, কাজুবাদাম ২ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা ২টি, শুকনো লঙ্কা ১টি, গোটা গরম মশলা ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাসুরি মেথি ১ চা-চামচ, মাখন ৩ টেবিল চামচ, মধু ১ চা-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো, নুন স্বাদমতো



কীভাবে বানাবেন

চিকেনে দই, আদা-রসুন বাটা, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন মাখিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। এরপর হালকা ভেজে তুলে রাখুন। অল্প তেলে কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ, টমেটো, কাজুবাদাম ও গোটা গরম মশলা সামান্য নেড়ে অল্প জল দিয়ে সিদ্ধ করুন। ঠান্ডা হলে মিহি করে বেটে নিন। প্যানে তেল ও মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা, ধনে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন কষিয়ে বাটা মশলা দিন। ভালো করে কষানো হলে চিকেন ও কাসুরি মেথি দিয়ে রান্না করুন। মশলা ধোয়া জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে ফুটিয়ে শেষে মাখন ও সামান্য মধু মিশিয়ে নামিয়ে নিন। গরম ফ্রাইড রাইস, পোলাও বা লাচ্ছা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাটন কারি

কী কী লাগবে

পাঁঠার মাংস ৭৫০ গ্রাম, আলু ২টি, পেঁয়াজ ৩টি, টমেটো ১টি, টকদই ১০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩টি, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা গরম মশলা ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল ৫-৬ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১/২ চা-চামচ, গরম জল প্রয়োজনমতো



কীভাবে বানাবেন

মাংসে টকদই, আদা-রসুন বাটা, হলুদ, জিরে-ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন মাখিয়ে অন্তত ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে আলু সোনালি করে ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে গোটা গরম মশলা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ সোনালি করে ভাজুন। এবার ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে ভালো করে কষান। টমেটো ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মশলা থেকে তেল ছাড়া পর্যন্ত কষিয়ে নিন। ভাজা আলু ও গরম জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে মাংস নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। প্রয়োজন হলে আরও গরম জল দিন। শেষে গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভুনি খিচুড়ি

কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল ১ কাপ, সোনামুগের ডাল ১ কাপ, কাজুবাদাম ২০ গ্রাম, কিসমিস ২০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ২ চা-চামচ, চিনি ২ চা-চামচ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, গরম জল ৪ কাপ

ফোড়নের জন্য:

তেজপাতা ২টি, এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৪টি, দারচিনি ১ টুকরো, শুকনো লঙ্কা ৪টি, গোটা জিরে ১ চা-চামচ



কীভাবে বানাবেন

চাল ৩-৪ বার ধুয়ে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জল ঝরিয়ে শুকনো করে নিন। সোনামুগের ডাল শুকনো কড়াইয়ে হালকা সোনালি করে ভেজে ধুয়ে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম করে কাজুবাদাম ও কিসমিস হালকা ভেজে তুলে রাখুন। ওই ঘিয়েই তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ও গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা মিশিয়ে নিন। এবার চাল ও ডাল দিয়ে হলুদ এবং ১ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো মিশিয়ে দেড়-দু'মিনিট ভালো করে ভেজে নিন। চাল ও ডালের মিশ্রণে ৪ কাপ গরম জল, নুন ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিয়ে কম আঁচে প্রায় ১০ মিনিট রান্না করুন। চাল-ডাল সেদ্ধ না হলে সামান্য গরম জল দিয়ে আরও ২-৩ মিনিট রান্না করুন। সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি, ভাজা কাজু-কিসমিস, বাকি গরম মশলা গুঁড়ো ও ১ টেবিল চামচ ঘি মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করুন। ঢাকা দিয়ে ২-৩ মিনিট রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন সুগন্ধি ভুনি খিচুড়ি।



সুস্মিতা দে দাস

মহাষ্টমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ভোগের লাবড়া

কী কী লাগবে

আলু ২টি, মিষ্টি কুমড়ো ২৫০ গ্রাম, রাঙা আলু ১টি, থোড় ১৫০ গ্রাম, গাজর ১টি, ফুলকপি ১০০ গ্রাম, বেগুন ১টি, বিনস ১০০ গ্রাম, পুঁই শাক ১ আঁটি, পালং শাক ১ আঁটি, Shalimar's সর্ষের তেল ৪-৫ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, শুকনো লঙ্কা ৩-৪টি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ ১ চা-চামচ, নারকেল কোরা কাপ, চিনি ২-৩ চা-চামচ বা স্বাদমতো, নুন স্বাদমতো

ভাজা মশলার জন্য:

গোটা জিরে ১ টেবিল চামচ, গোটা ধনে ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ২টি, শুকনো লঙ্কা ২টি, এলাচ ৪টি



কীভাবে বানাবেন

প্রথমে শুকনো কড়াইয়ে ভাজা মশলার সব উপকরণ ভালো করে ভেজে ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নিন। সব্জি ধুয়ে বড় টুকরো করে কাটুন। শাকের ডাঁটা ও পাতা আলাদা করে রাখুন। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে পাঁচফোড়ন, তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। প্রথমে বেগুন হালকা ভেজে বাকি সব্জি দিয়ে নেড়ে নিন। এরপর শাকের ডাঁটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে ঢাকা দিয়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। এবার শাকের পাতা দিয়ে মিশিয়ে কম আঁচে ঢাকা দিয়ে ১৫-২০ মিনিট রান্না করুন। কোনও জল দেবেন না; সব্জি ও শাক থেকে বেরোনো জলেই সেদ্ধ হবে। সব্জি নরম হয়ে এলে আদা বাটা ও নারকেল কোরা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে আবার ঢাকা দিন। জল শুকিয়ে সব্জি মাখো মাখো হয়ে এলে চিনি ও তৈরি করে রাখা ভাজা মশলা ৩ টেবিল চামচ মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করুন। ঢাকা দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট রেখে দিন। গরম গরম খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কুমড়োর ছক্কা

কী কী লাগবে

মিষ্টি কুমড়ো ১ ফালি, বড় আলু ২টি, ভেজানো ছোলা ১/৪ কাপ, নারকেল কোরা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২-৩টি, চিনি ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, ঘি ১ চা-চামচ

ভাজা মশলার জন্য:

গোটা জিরে ১ টেবিল চামচ, গোটা ধনে ১/২ চা-চামচ, এলাচের দানা ৪টি, শুকনো লঙ্কা ১টি

ফোড়নের জন্য:

গোটা জিরে ১/২ চা-চামচ, তেজপাতা ২টি, শুকনো লঙ্কা ২টি, Shalimar's Chef Spices হিং ১/৪ চা-চামচ



কীভাবে বানাবেন

প্রথমে শুকনো কড়াইয়ে ভাজা মশলার সব উপকরণ নেড়ে ঠান্ডা করে গুঁড়ো করে নিন। কুমড়ো বড় টুকরো করে এবং আলু ডুমো করে কেটে নিন। কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে কুমড়ো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলে জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও হিং ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা কষিয়ে নিন। এবার ভেজানো ছোলা দিয়ে একটু নেড়ে আলু, নুন ও হলুদ দিয়ে ভাজুন। আলু হালকা ভাজা হলে নারকেল কোরা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে ভাজা কুমড়ো মিশিয়ে দিন। এরপর জিরে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা ও চিনি দিয়ে অল্প গরম জল দিন। ঢাকা দিয়ে কম আঁচে আলু, কুমড়ো ও ছোলা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। সবশেষে ভাজা মশলা ও ঘি মিশিয়ে নামিয়ে নিন। গরম গরম লুচি, রুটি, পরোটা কিংবা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই চিরকালীন বাঙালি পদ।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দুধ শুক্তো

কী কী লাগবে

উচ্ছে ১টি মাঝারি, পেঁপে ১/৪টি, বেগুন ১/২টি, আলু ২টি মাঝারি, রাঙা আলু ১টি, কাঁচকলা ১টি, ঝিঙে ১টি, সজনে ডাঁটা ২টি, বিউলির ডালের বড়ি ১৫–১৬টি, দুধ ১ কাপ (২৫০ মিলিলিটার), Shalimar's সর্ষের তেল ৫ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো

ভাজা মশলার জন্য:

মেথি ১/৪ চা-চামচ, মৌরি ১/৪ চা-চামচ, রাঁধুনি ১/৪ চা-চামচ

ফোড়নের জন্য:

তেজপাতা ১টি, সর্ষে ১ চা-চামচ, রাঁধুনি ১ চা-চামচ

বাটা মশলার জন্য:

আদা বাটা ১ চা-চামচ, পোস্ত বাটা ১ টেবিল চামচ, সর্ষে বাটা ১ টেবিল চামচ



কীভাবে বানাবেন

সব্জিগুলি লম্বা করে কেটে নিন। সর্ষে ও পোস্ত বেটে রাখুন। কড়াইয়ে সর্ষের তেলে বড়ি, আলু, রাঙা আলু, কাঁচকলা, বেগুন ও উচ্ছে আলাদা করে ভেজে তুলে নিন। মেথি, মৌরি ও রাঁধুনি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করুন। এবার তেলে ঘি, তেজপাতা, সর্ষে ও রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে আদা বাটা, পেঁপে, সজনে ডাঁটা ও ঝিঙে দিন। বাকি ভাজা সব্জি, নুন ও অল্প জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। সর্ষে-পোস্ত বাটা ও বেগুন মিশিয়ে দুধ দিন। ফুটে উঠলে উচ্ছে ও বড়ি দিয়ে আরও ২ মিনিট রান্না করুন। সবশেষে চিনি, ভাজা মশলা ও ঘি দিয়ে আঁচ বন্ধ করে ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট রেখে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সাবেকি দুধ শুক্তো।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আলু পনিরের ডালনা

কী কী লাগবে

পনির ২৫০ গ্রাম, আলু ২টি মাঝারি, টমেটো ১টি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, গোটা জিরে ১/২ চা-চামচ, তেজপাতা ১টি, দারচিনি ১ টুকরো, এলাচ ২টি, লবঙ্গ ২টি, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, চিনি ১/২ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল প্রয়োজনমতো, নুন স্বাদমতো, গরম জল প্রয়োজনমতো



কীভাবে বানাবেন

আলু ডুমো করে কেটে নুন ও হলুদ মাখিয়ে সর্ষের তেলে হালকা সোনালি করে ভেজে নিন। পনিরের টুকরোগুলিও হালকা ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলে তেজপাতা, গোটা জিরে, দারচিনি, এলাচ ও লবঙ্গ ফোড়ন দিন। আদা বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে টমেটো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো ও নুন দিয়ে ভালো করে মশলা কষান। তেল ছাড়তে শুরু করলে ভাজা আলু দিয়ে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনমতো গরম জল ও সামান্য চিনি দিয়ে ঢাকা দিয়ে আলু সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর পনির দিয়ে আরও ৩–৪ মিনিট ফুটিয়ে গরম মশলা গুঁড়ো ও ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাত, লুচি বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু আলু পনিরের ডালনা।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সয়া চাপ মালাই

কী কী লাগবে

সয়া চাপ ২৫০ গ্রাম, টকবিহীন ঘন দই ৩ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ১/২ কাপ, দুধ ১/২ কাপ, কাজুবাদাম ১২-১৫টি, পোস্ত ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১টি, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১-২টি, সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কসুরি মেথি ১/২ চা-চামচ, চিনি ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Sunflower তেল ১ টেবিল চামচ, ঘি ১ চা-চামচ।



কীভাবে বানাবেন

সয়া চাপ গরম জলে ৫-৭ মিনিট ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে দই, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, গোলমরিচ ও নুন মাখিয়ে ২০-৩০ মিনিট রাখুন। কাজুবাদাম ও পোস্ত বেটে নিন। তেল-ঘিতে সয়া চাপ হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে পেঁয়াজ বাটা কষিয়ে কাজু-পোস্তর পেস্ট দিন। দুধ ও ক্রিম মিশিয়ে নুন, চিনি, গোলমরিচ ও গরম মশলা দিন। ভাজা সয়া চাপ দিয়ে অল্প আঁচে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন। শেষে কসুরি মেথি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।



স্বর্ণাভ হালদার

মহানবমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এঁচড়ের দম বিরিয়ানি

কী কী লাগবে

এঁচড় ৫০০ গ্রাম, বাসমতি চাল ৩০০ গ্রাম, আলু ২টি, পেঁয়াজ ৩টি, টক দই ১/২ কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, লাল Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, বিরিয়ানি মশলা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২টি, দারুচিনি ২ টুকরো, এলাচ ৪টি, লবঙ্গ ৪টি, শাহি জিরে ১/২ চা-চামচ, কেওড়া জল ১ চা-চামচ, গোলাপ জল ১ চা-চামচ, দুধ ৩ টেবিল চামচ, জাফরান এক চিমটি, ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো, নুন স্বাদমতো, চিনি ১/২ চা-চামচ।



কীভাবে বানাবেন

এঁচড় নুন-হলুদ মাখিয়ে ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। তেলে আলু ও এঁচড় হালকা ভেজে তুলে রাখুন। গোটা গরম মশলা ও শাহি জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে আদা-রসুন বাটা, দই ও গুঁড়ো মশলা কষিয়ে এঁচড়-আলু দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে বিরিয়ানি মশলা, গরম মশলা ও চিনি মিশিয়ে নিন। বাসমতি চাল গোটা গরম মশলা ও নুন দেওয়া জলে ৭০ শতাংশ সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখুন। ভারী পাত্রে এঁচড়ের মশলা ও ভাত পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে জাফরান মেশানো দুধ, ঘি, ভাজা পেঁয়াজ, কেওড়া জল ও গোলাপ জল ছড়িয়ে দিন। ঢেকে কম আঁচে ১৫–২০ মিনিট দমে রাখুন। আঁচ বন্ধ করে আরও ১০ মিনিট রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মুর্গ-এ-মল্লিকা

কী কী লাগবে

হাড়সহ চিকেন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২–৩টি, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কসুরি মেথি ১ চা-চামচ, ফ্রেশ ক্রিম ৪ টেবিল-চামচ, দুধ ১/৪ কাপ, ঘি ১ টেবিল-চামচ, Shalimar's Sunflower তেল প্রয়োজনমতো, তেজপাতা ১টি, দারুচিনি ১ টুকরো, এলাচ ৩টি, লবঙ্গ ৩টি, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো।



কীভাবে বানাবেন

চিকেনের সঙ্গে নুন, গোলমরিচ, সামান্য আদা বাটা ও ১ টেবিল-চামচ ক্রিম মাখিয়ে ২০–৩০ মিনিট রাখুন। তেলে চিকেন হালকা সোনালি করে ভেজে তুলে নিন। একই কড়াইয়ে ঘি, তেজপাতা ও গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ সোনালি করে ভাজুন। পেঁয়াজ, গোটা মশলা ও কাঁচা লঙ্কা অল্প জল দিয়ে বেটে নিন। সেই পেস্ট কড়াইয়ে দিয়ে আদা-রসুন বাটা ও গুঁড়ো মশলা কষিয়ে চিকেন মেশান। প্রয়োজনমতো গরম জল দিয়ে ঢেকে চিকেন সেদ্ধ করুন। শেষে কসুরি মেথি, বাকি ক্রিম, দুধ ও গরম মশলা দিয়ে কম আঁচে কয়েক মিনিট রান্না করুন। সামান্য ঘি ও গোলমরিচ ছড়িয়ে ঢেকে ২–৩ মিনিট রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



দিনাজপুরের হাঁড়িবন্ধ মাটন

কী কী লাগবে

পাঁঠার মাংস ৫০০ গ্রাম, ফেটানো দই ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ ২০০ গ্রাম, আদা কুচি ১ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১/২ টেবিল চামচ, লাল লঙ্কার পেস্ট ১/২ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, শুকনো লাল লঙ্কা ৮–১০টি, তেজপাতা ২টি, ছোট এলাচ ৩টি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি, কাঁচালঙ্কা ১০-১২টি, Shalimar's সর্ষের তেল ৩/৪ কাপ ও ফোড়নের জন্য ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, ঢাকনাসহ একটি মাটির হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ বন্ধ করার জন্য মাখা ময়দা।

কীভাবে বানাবেন

পাঁঠার মাংস দই, আদা, রসুন ও ৩ টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে ২–৩ ঘণ্টা, সম্ভব হলে সারা রাত, ম্যারিনেট করুন। এরপর পেঁয়াজ, লঙ্কার পেস্ট, হলুদ, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি, কাঁচা লঙ্কা, নুন ও বাকি তেল দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মাটির হাঁড়িতে ১ টেবিল চামচ সর্ষের তেল মাখিয়ে অল্প আঁচে গরম করে ঠান্ডা করুন। এবার মশলাসহ মাংস হাঁড়িতে দিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে ময়দার মিশ্রণ দিয়ে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করুন। একেবারে কম আঁচে প্রায় আড়াই ঘণ্টা রান্না করুন। প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর সাবধানে হাঁড়িটি সামান্য ঝাঁকিয়ে দিন। আঁচ বন্ধ করে ১৫–২০ মিনিট রেখে ঢাকনা খুলুন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন দিনাজপুরের সাবেকি হাঁড়িবন্ধ মাটন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছানা দিয়ে তুলাইপাঞ্জি চালের পায়েস

কী কী লাগবে

তুলাইপাঞ্জি চাল ৫০ গ্রাম, দুধ ১ লিটার, তাজা ছানা ১৫০ গ্রাম, চিনি ৮০-১০০ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, তেজপাতা ১টি, কাজুবাদাম কুচি ২ টেবিল চামচ, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, পেস্তা কুচি ১ টেবিল চামচ, নুন এক চিমটি।



কীভাবে বানাবেন

চাল ধুয়ে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। ছানা মেখে ছোট ছোট নরম টুকরো করে রাখুন। দুধে তেজপাতা দিয়ে ফুটিয়ে চাল মেশান এবং কম আঁচে নাড়তে নাড়তে চাল সেদ্ধ ও দুধ ঘন করুন। চিনি ও নুন দিয়ে ছানার টুকরোগুলি আলতো করে মিশিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। শেষে এলাচ গুঁড়ো, কাজুবাদাম, কিশমিশ ও পেস্তা দিয়ে আঁচ বন্ধ করে ১০-১৫ মিনিট ঢেকে রেখে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গন্ধরাজ ভাপা ভেটকি

কী কী লাগবে

ভেটকি মাছ ৪ টুকরো, টকদই ৩ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা দেড় টেবিল চামচ, আদা বাটা ১/২ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, গন্ধরাজ লেবুর রস প্রয়োজনমতো, গন্ধরাজ লেবুর খোসা কুচি সামান্য, গন্ধরাজ লেবুর পাতা ১-২টি, চেরা কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি, নুন ও চিনি স্বাদমতো।



কীভাবে বানাবেন

ভেটকি মাছের টুকরোয় নুন ও গন্ধরাজ লেবুর রস মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। এরপর স্টিলের কৌটায় মাছের সঙ্গে টক দই, কাজুবাদাম বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, সর্ষের তেল, নুন, সামান্য চিনি, চেরা কাঁচা লঙ্কা ও গন্ধরাজ লেবুর খোসা কুচি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। উপর থেকে গন্ধরাজ লেবুর পাতা দিয়ে কৌটোর ঢাকনা বন্ধ করুন।একটি বড় হাঁড়ি বা কড়াইয়ে জল গরম করে তার মধ্যে কৌটাটি বসিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ১৫–২০ মিনিট ভাপিয়ে নিন। মাছ ভালোভাবে সেদ্ধ হলে গ্যাস বন্ধ করে সাবধানে কৌটো বের করুন। ঢাকনা খুলে ওপর থেকে সামান্য গন্ধরাজ লেবুর রস ছড়িয়ে আরও ২ মিনিট ঢেকে রাখুন। ব্যস, তৈরি সুগন্ধি গন্ধরাজ ভাপা ভেটকি!



মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল

বিজয়া দশমী

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

চিংড়ি পোলাও

কী কী লাগবে

বাসমতী চালের ভাত ২ কাপ, চিংড়ি মাছ ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ১টি মাঝারি, আদা-রসুন বাটা ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা ২-৩টি, ঘি ১ টেবিল-চামচ, Shalimar's Sun-flower তেল ১ টেবিল-চামচ, তেজপাতা ১টি, দারচিনি ১ টুকরো, এলাচ ২টি, লবঙ্গ ২টি, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, চিনি ১/২ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ।



কীভাবে বানাবেন

চিংড়িতে নুন ও হলুদ মাখিয়ে তেলে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে ঘি দিয়ে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভেজে ধনে, জিরে ও কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো মেশান। এবার ভাজা চিংড়ি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে সামান্য জল দিন। মশলা মাখামাখা হয়ে এলে ঠান্ডা ভাত, চিনি ও গরম মশলা দিয়ে আলতো হাতে মিশিয়ে ২-৩ মিনিট নেড়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাদামী মাটন

কী কী লাগবে

মাটন ১ কেজি, পেঁয়াজ ৩টি, বাদাম ১০–১২টি, কাজুবাদাম ৮–১০টি, টক দই ২০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, এলাচ ৪টি, দারুচিনি ১ টুকরো, লবঙ্গ ৫–৬টি, সাদা মরিচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কেওড়া জল ১ চা-চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, Shalimar's সর্ষের তেল বা Shalimar's Sunflower তেল ৩ টেবিল চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।



কীভাবে বানাবেন

বাদাম ও কাজুবাদাম ভিজিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করুন। কড়াইয়ে তেল ও ঘি গরম করে এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে আদা-রসুন বাটা ও মাটন দিয়ে ১০–১২ মিনিট কষান। আঁচ কমিয়ে ফেটানো দই ও বাদামের পেস্ট দিয়ে ধীরে ধীরে কষিয়ে নিন। প্রয়োজনমতো গরম জল দিয়ে প্রেশার কুকারে ৪–৫টি হুইসেল দিন, অথবা মাটন নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে সাদা মরিচ, গোলমরিচ, কেওড়া জল ও সামান্য ঘি দিয়ে আরও ৫ মিনিট দমে রাখুন। গরম নান, কুলচা, রুমালি রুটি কিংবা জাফরানি পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেবু লঙ্কা মুরগী

কী কী লাগবে

মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টি কুচি, আদা ৩ ইঞ্চি, রসুন ১টি গোটা, দই ১/২ কাপ, লেবুর রস ১/২ টি লেবুর, লেবুর খোসা কুচি ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো দেড় চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা-চামচ, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, লেবুর স্লাইস ৪টি, কাঁচালঙ্কা ৪–৫টি, লাল কাঁচালঙ্কা ২টি, লেবু পাতা ৫–৬টি, ছোট এলাচ ২টি, দারচিনি ১ টুকরো, Shalimar's Sunflower তেল ১/৪ কাপ, নুন স্বাদমতো, জল প্রয়োজনমতো।



কীভাবে বানাবেন

আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কা বেটে নিন। মুরগির মাংসে এই বাটা, দই, নুন, আধ চা-চামচ গোলমরিচ, লেবুর রস ও খোসা মাখিয়ে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে এলাচ ও দারচিনি ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ হালকা সোনালি করে ভাজুন। ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে ধনে গুঁড়ো, হলুদ, আরও আধ চা-চামচ গোলমরিচ, কাঁচা লঙ্কা ও নুন দিন। প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ফুটিয়ে লেবুর স্লাইস ও লেবু পাতা দিয়ে কম আঁচে ২ মিনিট রান্না করুন। লেবুর স্লাইস তুলে বাকি গোলমরিচ গুঁড়ো ও লাল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। লেবু পাতা দিয়ে সাজিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

লেবুপাতায় ইলিশ

কী কী লাগবে

ইলিশ মাছ ৪ টুকরো, নুন স্বাদমতো, Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাজুবাদাম বাটা ২ টেবিল-চামচ, টকদই ২ টেবিল-চামচ, সর্ষে বাটা ২ টেবিল-চামচ, লেবুপাতা ৪-৫টি, Shalimar's সর্ষের তেল ২-৩ টেবিল-চামচ, কাঁচালঙ্কা ৪-৫টি।



কীভাবে বানাবেন

ইলিশ মাছের সঙ্গে নুন, হলুদ, কাজুবাদাম বাটা, টক দই, সর্ষে বাটা, সর্ষের তেল ও লেবু পাতা ভালোভাবে মাখিয়ে ২০-৩০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। এরপর মাছ একটি স্টিলের পাত্রে সাজিয়ে ওপর থেকে কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন। পাত্রটি ঢেকে স্টিমারে অথবা জলভরা কড়াইয়ে বসিয়ে ১০-১২ মিনিট ভাপে রান্না করুন, যতক্ষণ না মাছ সেদ্ধ হয়ে যায়। রান্না হয়ে গেলে আরও ২ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। শেষে ওপর থেকে সামান্য কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আগমনী ১৪৩৩

গল্প ১

একটি ভয়ঙ্কর গল্প

অভিজিৎ চৌধুরী



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেরাতে বৃষ্টি পড়ছিল ঝমঝম করে। আর তেমনি মেঘগর্জন! ওখলা ল্যান্ডফিলের অদূরে পশ্চিম দিকের একটা পোড়ো বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করছিল লোকটা। হাতে ব্রিফকেস। ব্রাউন রঙের। শার্ট-প্যান্ট-চুল ভিজে চুবচুবে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল কপালের বলিরেখা। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর, একরাশ ভয় আর উত্তেজনা নিয়ে শেষে সে ঢুকেই পড়ল হানাবাড়িটার ভেতরে।

এই গল্পটা ডাহুকি আগেও শুনতে চেয়েছে বিহানের মুখে, কিন্তু নানা কারণে-অকারণে, কাজে-কর্মে-ব্যস্ততায় গল্পটা পেড়েও আর শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করে উঠতে পারেনি বিহান। হয়তো কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এসে জল ঢেলে দিয়েছেন আলোচনায়, কিংবা কোনও জরুরি কাজে একজনকে উঠে যেতে হয়েছে তখনকার মতো। ব্যস, গল্প যে তিমিরে, সেই তিমিরেই! কিন্তু আজ আর সুযোগটা কোনওভাবেই মিস করতে চায় না ডাহুকি। খাটের পেছনে হেলান দেওয়ার বালিশটা বাঁ হাত দিয়ে কিঞ্চিৎ সুবিধেজনক জায়গায় ঠেলে সরিয়ে সে বিহানের চোখে চোখ রেখে বলল, "ওই হানাবাড়িতে ঢোকাটাই বোধ হয় ওর মোস্ট ফাটাল ডিসিশন ছিল, তাই না স্যার?"

"হয়তো।"

"আসলে মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগটাই ছিল ওর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ কারণ মেয়েটা আর কেউ নয়, ডাকসাইটে ডিটেকটিভ স্বয়ং প্রজ্ঞানপরাঙ্গম পূততুণ্ড স্যারের দিল্লি নিবাসী বন্ধুর মাসতুতো দিদির বান্ধবী," ডাহুকি খিল খিল করে হেসে উঠল। বিহান গম্ভীর গলায় বলল, "ওই সূত্রটা না থাকলে আজ থেকে দশ বছর আগে আমার মতো অল্পবয়সি অনামা একজন ডিটেকটিভ যে ডাক পেত না এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও অস্বীকার করা যায় না, দিল্লি পুলিশ কিন্তু এই অধমের সাহসিকতা ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়েছিল!"

"জানি স্যার, সে দিনের সেই শখের গোয়েন্দাই আজকের বিখ্যাত পিপিপি স্যার যাঁর অতি সাধারণ অখ্যাত সহকারীটি হাত ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকলেও, কাজ কখনও পড়ে থাকে না!"

"থাক, অনেক হয়েছে, প্লাস্টার কবে খোলা হচ্ছে?" বিহানের মুখে লাজুক হাসি।

"এই তো স্যার তিন দিন হল প্লাস্টার হয়েছে, এর মধ্যে খোলার কথা?" ডাহুকি প্রসঙ্গ এড়িয়ে গল্পে ঢুঁ মারার চেষ্টা করল, "বলছিলাম কী, মেয়েটার নামটা...আর কীভাবেই বা তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল লোকটার...আজ সবটা শুনব স্যার।"

"মধুমক্ষিকা মিশ্র," বিহান নির্লিপ্ত গলায় বলল, "একটা ডেটিং সাইটে যোগাযোগ হয়েছিল ওদের।"

"আর লোকটার নাম? যদিও আপনি বলেছিলেন আগে, এখন আর মনে করতে পারছি না।"

"লোকটা জাপানি। মিৎসুয়াকি তাকাহাশি। ভীষণ ট্যালেন্টেড। জাপানের কোবে শহরে এক বিত্তশালী পরিবারে জন্ম। পড়ত ওয়াকো ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে সোজা প্যারিসে চলে গিয়েছিল হায়ার এডুকেশনের জন্য। সেখানে ফিল্ম স্টাডিজ নিয়ে বছর দুয়েক পড়াশোনা করে চলে আসে জে এন ইউতে। তারপর থেকে দিল্লিতেই!"

কোনও সন্দেহ নেই, মধুমক্ষিকা খুব দ্রুত মিৎসুয়াকির প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সে প্রেম স্বাভাবিক প্রেম ছিল না নিশ্চিত! নইলে ডেটিং অ্যাপ থেকে সরাসরি মিৎসুয়াকির ডেরায় এসে হাজির হবে কেন সে? একটা শিক্ষিত বনেদি ঘরের মেয়ে এটুকু জানবে না যে, প্রথম ডেটিংটা কোনও ক্যাফে কিংবা রেস্তরাঁ, নিদেনপক্ষে কোনও পার্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত? একটা মানুষকে দেখলাম না, চিনলাম না, সরাসরি তার বেডরুমে গিয়ে হাজির হতে হবে? নিজেকে কতটা বিলিয়ে দিলে, কতখানি সমর্পণ করলে, এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, স্বয়ং ঈশ্বর জানেন! আসলে মিৎসুয়াকির প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার অনেক আগে থেকেই মধুমক্ষিকার ছিল জাপানি সভ্যতা, জাপানি সংস্কৃতি তথা জাপান দেশটার প্রতিই অবিমিশ্র প্রেম। সেই হামাগুড়ি দেওয়ার বয়স থেকেই তার জাপানি কার্টুনের সঙ্গে সখ্য। যত সে বড় হয়েছে একটু একটু করে, তত পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তার জাপান প্রেম! জাপানে পড়াশোনা করতে যাওয়ার শখ না মিটলেও, শিখেছে জাপানি ভাষা। মজেছে জাপানি মুভি ও জাপানি সাহিত্যে। মনের মধ্যে আজন্ম লালন করেছে জাপানে পৌঁছে সে দেশের মানুষজন, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার স্বপ্ন। আর এ সব কিছুরই চরম মূল্য চোকাতে হয়েছে মনখোলা মধুমক্ষিকাকে।

মিৎসুয়াকির ডেরায় তাজা গোলাপ নিয়ে মধুমক্ষিকা ঢুকেছে ঠিক



বেলা দশটায়। তারপর সে আর বেরোয়নি। পুলিশকে ইনফর্ম করা হয়েছে সে দিন মাঝরাতে, আর বিহানের ডাক পড়েছে আরও দু'দিন পর। ওই দু'দিনে আক্ষরিক অর্থে পুলিশ কিছুই করে উঠতে পারেনি। বিহান এসে হাল না ধরলে হালে পানি পেত নাকি পুলিশ?

প্রথম সাক্ষাতেই মধুমক্ষিকাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল মিৎসুয়াকি, "মাই অ্যাঞ্জেল, রিলিজ মি ফ্রম মাই লোনলিনেস!"

"ফ্রম দিস ডে, ইউ আর নট অ্যালোন মাই ডার্লিং।" তারপর হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া সব কিছুই হয়েছিল যেমন হয় আরকী! সঙ্গে দেদার যৌনতা। মধুমক্ষিকার তরফ থেকে কোনও প্রতিরোধই ছিল না বলা যায়। "হোয়াট ডিশ ডু ইউ লাভ টু ইট ডিয়ার?" মধুমক্ষিকার প্রশ্নে মিৎসুয়াকি মোক্ষম উত্তর দিয়েছিল, "লাভ টু ইট ইউ..."

"হোয়াট?" উত্তেজনায় ডাহুকির চোখের মণি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

"আশ্চর্যের কী হল? এমন উত্তরে প্রেমিকা শরীর খুলে ধরেছে প্রেমিকের কাছে–খাও!" বিহান যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল ডাহুকিকে, "মধুমক্ষিকা তো আর জানত না, তার প্রেমিক ক্যানিবাল।" সত্যিই তো, লোকটা যে ম্যান-ইটার ডাহুকি সেটা ইতিপূর্বে বিহানের কাছে শুনেছে বলেই না মিৎসুয়াকির ওই কথায় আজ তার এমন প্রতিক্রিয়া হল, নচেৎ সেও নিশ্চয়ই ভাবত, যেমনটা ভাবে সবাই, মিৎসুয়াকি অপরিসীম শরীরী সম্পর্কের ইঙ্গিতই করেছিল মধুমক্ষিকাকে। যাই হোক, যৌন সম্পর্ক চলাকালীনই যেভাবে ভারী পাথর দিয়ে মধুমক্ষিকার মাথা আচমকা থেঁতলে দিয়েছিল মিৎসুয়াকি, এবং মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আঘাত করেছিল অপেক্ষাকৃত আরও জোরে, শরীরের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, অপরাধবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' আখ্যা দেওয়াই যায়।

তারপর? তারপর মধুমক্ষিকার নাক ও ঠোঁট কামড়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছিল মিৎসুয়াকি। পারেনি। চোখ উপড়ে খেতে চেয়েছিল। তাও পারেনি। কারণ তার দাঁত দুর্বল ছিল। সাধারণত, ক্যানিবালদের দাঁত হয় অত্যন্ত ধারালো আর মজবুত। কিন্তু মিৎসুয়াকি ছিল ব্যতিক্রম। সে সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে মাংস কাটার ছুরি কিনতে বেরিয়েছিল তখুনি। ফিরে এসে কুচি কুচি করে কেটে ফেলেছিল শরীরের অপেক্ষাকৃত নরম অংশগুলো–নাক, কান, ঠোঁট, চোখ, স্তন ও যৌনাঙ্গ। সেগুলো কাঁচাই খেয়েছিল যতটা পারে। আর ঘাড়, গলা, ঊরু ও নিতম্ব থেকে তাল তাল মাংস কেটে আলাদা আলাদা প্লাস্টিকের ক্যারি প্যাকে পুরে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল সযত্নে। নিজের মোবাইল ফোনে এই সমস্ত কাটা অঙ্গগুলোর ছবিও তুলে ফেলেছিল মিৎসুয়াকি, যা পরবর্তীতে বিহানের সহযোগিতায় দিল্লি পুলিশ উদ্ধার করে।

সে দিন ডিনারেই আবার মানুষের মাংস খেতে ইচ্ছে হয় মিৎসুয়াকির। সে ফ্রিজ থেকে এক তাল মাংস বের করে কিছুক্ষণ ঘরের তাপমাত্রায় রেখে, দই দিয়ে ম্যারিনেট করে সেই মাংস ওভেনে চড়ায় তরকারি রান্নার জন্য! রান্নাঘরের উনুনে টগবগ করতে থাকা মাংসের তরকারির গন্ধ সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। যদিও মিৎসুয়াকির ডেরা ছিল দক্ষিণ দিল্লির শাহীন বাগের যথেষ্ট নির্জন জায়গায়, তদন্তে বেরিয়ে আসে, মাংসের গন্ধ গিয়ে পৌঁছেছিল দূরবর্তী কয়েকটি বাড়িতেও। এরপর টানা পাঁচ দিন ধরে লাঞ্চ ও ডিনারে মাংস রান্না করে মিৎসুয়াকি, এবং তদন্তে প্রকাশ, সে গন্ধ নিকটবর্তী এলাকায় ছড়িয়েও পড়ে। আসলে নরখাদকরা কিছুতেই নিজেদের লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

ততক্ষণে ডাহুকির মা ডিম সেদ্ধ, চিকেন স্যুপ আর সবজি স্যান্ডউইচের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছেন মেয়েকে খাওয়াতে। বিহানের শেষ কথাগুলো শুনে তিনি সহমত পোষণ করলেন, "নরমাংসে নরখাদকদের কখনও অরুচি হয় না।"

"তুমি কী করে জানলে?" ডাহুকি প্রশ্ন করল মাকে।

"এই তো সে দিনই রাশিয়ার নাগরিক নাতালিয়া বকশিবার কথা পড়লাম খবরের কাগজে। তার দোসর হাজবেন্ড দিমিত্রি বকশিবা। খুনের অভিযোগে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। তদন্ত শুরু হয়। তাদের বাড়িতে হানা দিয়ে সেদ্ধ করা নরমাংস উদ্ধার করে পুলিশ। রেফ্রিজারেটর থেকেও মেলে কাঁচা মাংস। এ ছাড়া রান্নাঘরে কাচের বয়ামের মধ্যে দেখা যায় থরে থরে সাজানো ছোট ছোট মাংসের গোলা।"

"একদম ঠিক বলেছেন," বিহান পকেট থেকে মোবাইলটা বের করতে উদ্যত হল, "তদন্তে প্রকাশ, গ্রেফতার হওয়ার আগে পর্যন্ত মোট ত্রিশ জনকে খুন করে তাদের মাংস খেয়েছিল নাতালিয়া।"

"টাকা-পয়সা কি ছিল না ওদের? ঢুকতে পারত না দামি রেস্তরাঁয়? অর্ডার করতে পারত না পছন্দের খাবার? কিন্তু ওই যে, শকুনের নজর ভাগাড়ের দিকে! খুন করতে হলে তাও ভি আচ্ছা, কিন্তু নরমাংস ছাড়া চলবে না নরখাদকদের! বুঝেছ?" কম্পিউটার টেবিলের ওপর একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর খাবারের ট্রেটা রাখলেন ডাহুকির মা।

বিহান একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোনে এনগেজড হল আর সেই সময়ে মেয়েকে খাইয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মা। কথা শেষ হলে ফোনটা পকেটস্থ করে বিহান জলের বোতলটা ডাহুকির দিকে বাড়িয়ে দিল, "এইবার একটু রেস্ট নে, আমি উঠি।"

"কিন্তু শেষটা?" ডাহুকির গলায় একরাশ কৌতূহল।

"শেষটা তো শুরুতেই বলে দিয়েছি," বিহান মৃদু হাসল, "হাতে ব্রাউন ব্রিফকেস আর চুবচুবে ভিজে পোশাকে লোকটা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে খানিক ইতস্তত করে হঠাৎই ঢুকে পড়ল সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার মধ্যে।"

"আর তোমরা তাকে ফলো করছ বাইরে থেকে?" বাঁ হাত দিয়ে বোতলের ছিপি খুলল ডাহুকি।

"এগজ্যাক্টলি," বিহান প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, "আমরা মানে আমি আর সাদা পোশাকের পুলিশ।"

"আমার মনে হয়," গভীর চিন্তায় মগ্ন ডাহুকি ভ্রু কুঁচকে বলল, "হানাবাড়িতে ঢোকার পরিকল্পনা ছিল না লোকটার, ও ডিসিশন চেঞ্জ করেছিল।"

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

"সঠিক পর্যবেক্ষণ, আসলে..."

"পিপিপি স্যারের অ্যাসিস্টেন্ট কি এমনি এমনি হলাম স্যার?" বিহানকে থামিয়ে দিয়ে ডাহুকি মজা করল।

"জোকস অ্যাপার্ট, আমাদের ধারণা ব্রিফকেস ফেলার জন্য মিৎসুয়াকি ওখলা ল্যান্ডফিলকেই টার্গেট করেছিল। ওখলা ল্যান্ডফিল দিল্লির সবচেয়ে বড় তিনটে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একটা। তার এত কাছাকাছি এসেও, কোনও তাৎক্ষণিক কারণে তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল, ওই পোড়ো বাড়িটাই তার কার্যসিদ্ধির জন্য কম্প্যারেটিভলি বেটার প্লেস।"

"আর এই ডিসিশনটাই ওর চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছিল," বাচ্চাদের মতো বোতলে মুখ লাগিয়ে জল খেল ডাহুকি।

অমন অপ্রতিহত বৃষ্টি আর আকাশ ফালা করা বিদ্যুৎচমকের ভেতর পাঁচ-ছ'দিনের বাসি হাড়গোর আর দুর্গন্ধযুক্ত পচা ছাঁট মাংস ভর্তি ব্রিফকেস হাতে মিৎসুয়াকি এমনি এমনিই কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল। তার ওপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অভিঘাত তাকে আরও বেসামাল করে দিয়েছিল। সে ওই পোড়ো বাড়ির ভেতর ঢুকে সম্ভবত মধুমক্ষিকার ছায়া দেখতে পায়। মধুমক্ষিকার প্রেতাত্মা তাকে সারা বাড়ি তাড়িয়ে বেড়ায়। সে পাগলের মতো ছুটতে থাকে এ দিক থেকে ও দিকে। বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ ঠাহর করতে পারে না। বাইরে থেকে বিহান এবং সাদা পোশাকের পুলিশ তাকে মধুমক্ষিকার নাম ধরে আর্তনাদ করতে শোনে। এ রকম কিছুক্ষণ চলতে থাকার পর হঠাৎই সব স্তব্ধ হয়ে যায়। যাকে বলে একেবারে পিনড্রপ সাইলেন্স! বৃষ্টিও ধরে আসে। অনেকক্ষণ ধরে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে শেষে অপেক্ষারত পুলিশ বিহানকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। গভীর রাতে ওই বাড়ির পরিত্যক্ত কুয়োয় তারা ব্রিফকেস সমেত মিৎসুয়াকিকে আবিষ্কার করে। আর তার বাইকটা উদ্ধার হয় হানাবাড়ি থেকে অন্তত আড়াইশো মিটার দূরে। পর দিন কুয়ো থেকে যখন মিৎসুয়াকিকে তোলা হল তখন, বলা বাহুল্য, ধড়ে আর প্রাণ ছিল না।





আগমনী ১৪৩৩

গল্প ২



যে শহর গুহার মতোই

রাহুল দাশগুপ্ত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজটা দেখে একটু অবাকই হল চঞ্চল। চিত্রা পাঠিয়েছে? আর তাও এতদিন পর! ব্যাপারটা কী?

মাস পাঁচেক আগে চিত্রার বিয়ে হয়ে যায়। তারপরই অজানা এক শহরে চলে যায় সে। এই শহরের নাম আগে কখনও শোনেনি চঞ্চল। তার বন্ধু বা চেনা-পরিচিতের মধ্যে কেউই শোনেনি। চিত্রার বিয়ের দিন তারা প্রথম শুনেছিল। আর আশ্চর্য হয়েছিল খুব।

বিয়ের পর ওদের কারও সঙ্গেই কোনও যোগাযোগ রাখেনি চিত্রা। ওরাও একটু একটু করে ভুলে গেছে চিত্রাকে। ওদের বন্ধুদের প্রায় সকলেই। কিন্তু চঞ্চল ভুলতে পারেনি। চিত্রাকে ভুলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। চিত্রাকে এক সময় ও ভালোবেসেছিল।

কিন্তু চিত্রা বন্ধুত্বের বেশি আর এগোতে দেয়নি ওকে। চঞ্চল একদিন ওকে চুমু খেতে চেয়েছিল। সমুদ্রের ধারে বসেছিল ওরা। জায়গাটা হঠাৎই খুব নির্জন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিত্রা রাজি হয়নি। বিন্দুমাত্র উত্তেজিত বা বিরক্ত না হয়ে শান্ত স্বরে বলেছিল, সুখেন যদি জানতে পারে, আমি কী জবাব দেব? ওকে আমি ঠকাতে পারব না...

চিত্রা সেই সময় তুমুল প্রেম করছে সুখেনের সঙ্গে। অজানা এক শহর থেকে ওদের কলেজে পড়তে এসেছিল সুখেন। চিত্রার সঙ্গে তখনই ওর পরিচয়। দুজনেরই দুজনকে ভালো লেগে গিয়েছিল। সুখেন অনেক দূরের, এক রহস্যময়, অজানা শহরে থাকে জেনেও চিত্রা পিছিয়ে যায়নি। বরং সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, এই সম্পর্কটা ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু সুখেনকে নয়। সুখেনকে ছাড়া জীবন কাটানোর কথা ভাবা ওর পক্ষে অসম্ভব। আর বাস্তবেও ঠিক সেটাই ঘটেছিল। সবাইকে ছেড়ে, নিজের পরিবার-আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব-চেনা পৃথিবী ছেড়ে চিত্রা পাড়ি দিয়েছিল এক অজানা, রহস্যময় শহরের দিকে। তাকে নিয়ে সকলেরই আশঙ্কা ছিল। হয়তো ও সুখী হবে না। কিন্তু চিত্রা সুখী হয়েছিল। চিত্রার ভাইয়ের কাছ থেকে এরকমই খবর পেয়েছিল চঞ্চল। সে নিয়মিত চিত্রার খোঁজ নিত।

কিন্তু কোনও দুর্বোধ্য কারণে, চঞ্চলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখেনি চিত্রা। চঞ্চলের তাই মাঝেমধ্যেই মনে হত, চিত্রা কী তাকে একেবারেই ভুলে গেল? সে তো শুধু একটা চুমুই খেতে চেয়েছিল চিত্রাকে। তার বেশি তো কিছু চায়নি! সেই জন্যই কী চিত্রা তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন শাস্তিটি দিল, যার নাম, 'বিস্মৃতি?'

হোয়াটসঅ্যাপে চিত্রা যা লিখেছে, সেটা আরও একবার পড়ে দেখল চঞ্চল। মাত্র দু-লাইন। কিন্তু কী সাংঘাতিক! চিত্রা লিখেছে, 'একবার আমাদের শহরে আসতে পারো? আমার খুব বিপদ।' হঠাৎ এরকম একটা মেসেজ পাঠালো কেন চিত্রা? এর যে মাথা-মুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। চিত্রা কী এমন বিপদে পড়ল? বিয়ের পর ও তো সুখী হয়েছে বলেই সে জানত!

কিন্তু এরকম মেসেজ পেলে দেরি করা যায় না। চঞ্চল তাই সেদিন বিকেলেই বাসে চেপে বসল। এই বাস তাকে নিয়ে যাবে চিত্রার শহরের কাছাকাছি। অবশ্য চিত্রা যে শহরে থাকে, সেটা আসলে একটা দ্বীপ। বাসে চেপে সেই দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না। একটা স্টিমারে চেপে যেতে হয়। সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসা একটা খাঁড়ি পেরোতে হয়। আধ ঘণ্টার মতো লাগে তাতে। গুগল ম্যাপে দেখে নিয়েছে চঞ্চল। চিত্রাকে বারবার হোয়াটসঅ্যাপ করেও সে কোনও উত্তর পায়নি। এর মধ্যেই চিত্রার কোনও বিপদ হল না তো?

চঞ্চলের সঙ্গে একটা ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই নেই। সামান্য কয়েকটি জামাকাপড়। জলের বোতল। সে কোথায় চলেছে সে ব্যাপারে তার কোনও ধারণাই নেই। সেখানে গিয়ে কী দেখবে, তাও সে জানে না। কতদিন থাকতে হবে সেখানে? কোথায়ই বা থাকবে? বেশি টাকা-পয়সাও সঙ্গে নেই। চিত্রাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে নিজে আবার কোনও বিপদে জড়িয়ে পড়বে না তো?

বাসটা এসে যেখানে দাঁড়াল, সেই জায়গাটা একটা জঙ্গলের মতোই। সরু একটা খাঁড়িতে স্টিমারটা দাঁড়িয়ে ছিল। টিকিট কেটে স্টিমারে উঠে পড়ল চঞ্চল। স্টিমারটি ছোটো, খাঁড়িটা একটু একটু করে চওড়া হচ্ছিল। দুপাশে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। জলের রং গোড়ায় ছিল ঘোলা। একটু পরেই তা স্বচ্ছ হতে শুরু করেছিল। চঞ্চল মুগ্ধ হয়ে চারপাশের প্রকৃতি দেখছিল।

কিন্তু একটু পরেই তার সারা শরীরে অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার এসে বসল নিজের সিটে। হাত দিয়ে সে নিজের পেটটা চেপে ধরেছিল।

পাশের ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, কী হয়েছে আপনার? কোনও



সমস্যা হয়েছে নাকি?

চঞ্চল প্রথমটায় ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। সে কী বলবে? এভাবে কী কাউকে নিজের শারীরিক সমস্যার কথা বলা যায়? কেউ সহানুভূতি দেখাতে চাইছে বলেই কী তাকে বিব্রত করা উচিত?

কিন্তু না বললেই যে নয়! সমস্যা যে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সে তাই বলল, পেটে হঠাৎ ব্যথা করছে।

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, এটা কী আপনার পুরোনো কোনও রোগ?

চঞ্চল অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ, আগে প্রায়ই ভোরের দিকে আমার পেটে ব্যথা করত।

ভদ্রলোক আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাই বলুন! ওই পুরোনো রোগটাই তাহলে ফিরে এসেছে।

চঞ্চল আরও অবাক হয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন...

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, কী আর বলব বলুন! এটা এই শহরেরই একটা বৈশিষ্ট্য! এই শহরে ঢোকার সময় অনেকেরই পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে তাদের পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসে। আপনার ক্ষেত্রে দুটোই হয়েছে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। স্টিমার থেকে নামলেই ব্যথা কমে যাবে।

খাঁড়িটি এখন একটা চওড়া নদীতে গিয়ে মিশেছে। দুপাশের তীর অনেকটা দূরে সরে গেছে। জলের রং কাচের মতোই স্বচ্ছ। কখনও বা হালকা সবুজ। এখানে জলের গভীরতাও অনেক বেশি। ঢেউ যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন স্টিমারটা যেন একটা খেলনার মতোই প্রবলভাবে দুলে উঠছে।

স্টিমারটা যেখানে গিয়ে থামল, সেই জায়গাটা একদম ধু-ধু করছে। অবশ্য তীরের কাছটায় কিছুটা গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে। গাছগুলো সবুজ নয়, কালো। যেন সেগুলোকে কেউ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সারা শরীর ঝলসে দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও তারা বেঁচে আছে।

জঙ্গলের মতো জায়গাটা পেরিয়ে গেলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ধু-ধু প্রান্তর। সকলেই হাতে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে এই প্রান্তরটি পেরিয়ে চলেছে। কারও মুখে একটাও কথা নেই। এত নিঃশব্দ সবকিছু, এত গম্ভীর, চঞ্চলের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। সে কেঁপে উঠল হঠাৎ। সে আরও আশ্চর্য হয়ে দেখল, তার পেটের ব্যথা একদমই সেরে গেছে। যেন ওটা একটা ইশারা ছিল। একটা সংকেত। কিন্তু কিসের সংকেত?

চঞ্চল তার সঙ্গীর কাছে জানতে চাইল, কতদূর শহর?

দূরে একটা উঁচু দেওয়াল দেখতে পাচ্ছেন? ওর পেছনেই...

চঞ্চল দেওয়ালটা আগেই দেখতে পেয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, ওটা একটা পাহাড়। কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে।

শহরটা তাহলে আর দূরে নয়! ও যেন চিত্রার মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। লাল দুটো ঠোঁট। ওই ঠোঁটগুলো সে একদিন ভিজিয়ে দিতে চেয়েছিল।

ঠিক সেই সময় একটা বীভৎস, জান্তব চিৎকারে চারপাশের প্রকৃতি যেন সচকিত হয়ে উঠল।

চঞ্চলের সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মুখের সমস্ত রক্ত কে যেন শুষে নিয়েছে। সঙ্গী ভদ্রলোকের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সে জানতে চাইল, ওটা কিসের আওয়াজ?

সাইজের ক্যাফে-হোটেল-রেস্তোরাঁ, খাবারের নানা আয়োজন... আর কিছুই নেই...

তুমি তাহলে খুবই বিপদে আছো দেখছি...

চঞ্চল বলল। আর কথাটা শেষ করেই তার মনে হল, সত্যিই তার অসম্ভব খিদে পাচ্ছে এখন। পেটের ভেতর যেন আগুন জ্বলছে। নিজেকে সে কিছুতেই সামলাতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, হাতের সামনে যা আছে, তাকেই মুখে পুরে দেয়...

আর সত্যিই সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে দিল। ওর অবস্থা দেখে চিত্রা আরও বেশি বেশি করে অর্ডার দিতে লাগল। আর যে খাবারই আসছিল, চঞ্চল নিমেষের মধ্যে তা সাফ করে দিচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত একটা বড়ো ঢেঁকুর তুলে সে জানতে চাইল, সুখেন কেমন আছে?

কেমন আর থাকবে? চিত্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, শুধু খায়, আর কিছুই করে না...

তোমাদের কোনও সন্তান নেই...

না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল চিত্রা। অবশ্য সুখেনের দাদার একটি ছেলে আমাদের সঙ্গেই থাকে। তার দশ বছর হয়নি এখনও। ওকে একটা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না বোধহয়...

চঞ্চলের আগের মতোই বিভ্রান্ত লাগছে। সত্যিই, অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কী করতে পারে সে?

চিত্রাই আবার বলে উঠল, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। তুমি এখনও এখানে নতুন। এই শহর এখনও তোমাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। চলো, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই...

বেশ তো। চঞ্চল কিছুটা আশ্চর্য হয়েই বলল, সে তো তুমি আগেই চলে যেতে পারতে। এতদিন কীসের অপেক্ষায় ছিলে চিত্রা?

চাইলে এই শহর ছেড়ে কেউ যেতে পারে না। তার জন্য একটা টিকিট লাগে। চিত্রার স্বর বিষণ্ণ শোনাল। আর সে টিকিট দিতে পারে কোনও বিদেশিই। ঠিক তোমার মতো কেউ।

টিকিট? কীসের টিকিট? অবাক হয়ে জানতে চাইল চঞ্চল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রশ্নটাকে এড়িয়ে সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে চিত্রা বলল, আধ ঘণ্টা, ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই তোমার ওই প্রচণ্ড ক্ষুধাটা আবার ফিরে আসবে। তখন কিন্তু আর কিছুই করার থাকবে না। এই শহরের কাছে তুমি তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে...

চঞ্চল বলল, তাহলে উঠি চলো...

চিত্রা বলল, এই প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে আমি কোথায় যাব? কে আমাকে আশ্রয় দেবে? শুধু তুমি আমাকে বাঁচাতে পারো...

চঞ্চলের খুব মায়া হল চিত্রার প্রতি। গভীর সমবেদনা নিয়ে সে বলল, বেশ তো, কী করতে হবে, বলো আমাকে...

চিত্রা হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সে বলল, এভাবে খেতে থাকলে কেউ আমরা বাঁচব না চঞ্চল। আমরা সবাই মরে যাব। খেতে খেতেই মরে যাব। তবু আমাদের ক্ষুধা মিটবে না। বুকের ভেতর মুঠো মুঠো অতৃপ্তি নিয়েই আমাদের চলে যেতে হবে...

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল সমুদ্রের ধারে। মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। তারপর লোকসমাগম এড়িয়ে চলে গিয়েছিল সেই জায়গায়, যেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের নোনা বাতাস এসে ঝাপটা মারছিল ওদের চোখে-মুখে।

মিনিট কুড়ি হয়ে গেছে, ওরা কেউ কোনও কথা বলেনি। কিন্তু এই জায়গাটা সম্পূর্ণ নির্জন। চিত্রা ছাড়া আর কেউ নেই চঞ্চলের পাশে। চঞ্চল চিত্রার সুন্দর মুখটার দিকে মুগ্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় ফিসফিস করেই জানতে চাইল, এবার বলো, কী করতে হবে আমাকে?

চিত্রার মুখে যেন একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই সঙ্কোচকে এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে সে যেন দপ করে জ্বলে উঠল, তুমি আমাকে একটা চুমু খেতে চেয়েছিলে না?

চিত্রার মুখে এবার কেউ যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিল না চঞ্চল। চিত্রা যেন ঘোরের মধ্যেই বলে চলল, সুখেনকে আমি ডিভোর্স দিয়েছি চঞ্চল। আমি ভুল করেছিলাম। আমি কিন্তু শুধু ওই চুমুটার অপেক্ষায় আছি...
আমি চুমু খেলেই তুমি এখান থেকে বাইরে যাওয়ার টিকিট পেয়ে যাবে চিত্রা? চঞ্চল সংশয়মুক্ত হতে চাইল।
চিত্রা বলল, তোমার মতো একজন বিদেশিকে যদি আমি জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিই, তবেই ওরা আমাকে এই শহর ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে। তুমিই আমার টিকিট। কিন্তু তোমার ওপর আমি কোনও জোর করতে পারি না। ওই চুমুটার জন্য এখনও কী তোমার আফশোস হয়? সেদিন রাজি হইনি, আর আজ তোমার ওই একটিমাত্র চুমুই আমাকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু আগে তো জানতে হবে, ওই চুমুটাকে তুমি আগেই খরচ করে ফেলেছ কি না...
হঠাৎ চিত্রাকে নিজের কাছে সপাটে টেনে নিল চঞ্চল। তারপর নিজের ঠোঁট দুটোর ভেতর টেনে নিল চিত্রার দুটো ঠোঁট, তারপর ওর জিভ, চুষতে লাগল সেগুলো। গভীর আবেশে বুজে এল চিত্রার চোখ।

একটু পরে চঞ্চল ক্লান্ত স্বরে জানতে চাইল, এবার আমরা যেতে পারি?
পারি। জড়ানো গলায় বলল চিত্রা। যেন বহু দূর থেকে তার স্বর ভেসে আসছে।

আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে চিত্রা, চঞ্চল কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, তবু খিদে পাচ্ছে না কেন?

চিত্রা শান্ত স্বরে বলল, আর পাবে না। খিদেটাই কী সব? তার চেয়েও কী জরুরি কিছু নেই? এই শহর এক ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় ডুবে আছে। এই শহর ঠিক এক অন্ধকার গুহার মতোই। তুমি আমাকে সেই দীর্ঘ অন্ধকার গুহা থেকে ঠেলে বার করে দিয়েছ...

খুব নিশ্চিন্ত শোনায় চিত্রার গলা। বুক ভর্তিকরে যেন সে সমুদ্রের নোনা বাতাস টেনে নিতে থাকে।
চঞ্চল বালির ওপর শুয়ে পড়েছিল। সে ওপরের গেঞ্জিটা খুলে ফেলেছিল। তার খালি গায়ে মাঝেমধ্যে স্পর্শ করে যাচ্ছিল সমুদ্রের জল। অসম্ভব ঠান্ডা সেই জল। সাদা ফেনায় ভর্তি। আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র জ্যোতিষ্ক। ঝলমল করছে তারা। চঞ্চল নিষ্পলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ দূর থেকে শোনা গেল কুকুরের ডাক। একটা কুকুর যেন তীব্র বেগে ছুটে আসছে। চিত্রা সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, পালাও, পালাও...

কিন্তু চঞ্চল কিছু বুঝে ওঠার আগেই হিংস্র কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল চঞ্চলের খোলা বুকের ওপর। অসম্ভব খিদে পেয়েছে তার। ধারালো দাঁত দিয়ে কামড়ে, ছিঁড়ে নিল বুকের এক খাবলা মাংস। একটা নখ বসিয়ে দিল চঞ্চলের বাঁ-চোখে। চঞ্চলের চোখের মণিটা ছিটকে বেরিয়ে এল।

চিত্রার চোখের সামনেই শিকারি কুকুরটা একটু একটু করে খেতে লাগল চঞ্চলকে। চঞ্চল বা চিত্রা, কোনও বাধা দেওয়ার সময়ই পেল না। ক্ষুধা মিটলে কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল চিত্রার দিকে। চিত্রার বুকে মাথা ঘষতে লাগল।

অন্ধকার ফুঁড়ে এবার এগিয়ে এল সুখেন। তারপর হাসতে হাসতে বলল, আর কতবার চেষ্টা করবে চিত্রা? এই নিয়ে পাঁচবার হল।
চিত্রা ফুঁসতে লাগল। বলল, তুমি আমাকে যেতে দেবে না?
সুখেন বলল, তোমার জিমিই তোমাকে যেতে দেবে না। ওর অসম্ভব খিদে। ঠিক এই শহরটার মতোই।
ও জানল কী করে আমি এখানে আছি? তুমিই এনেছো, তাই না? তুমি সবসময় আমাকে অনুসরণ করো...
জিমিকে কে প্রথম নিয়ে এসেছিল? কার ছিল কুকুর পোষার শখ? কে জিমিকে ট্রেনিং দিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে আজ এরকম ভয়ঙ্কর করে তুলেছে?
চিত্রা কোনও উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু আর এখানে থাকার জো নেই। তার অসম্ভব খিদে পাচ্ছে। এখনই তাকে কিছু খেতে হবে।

একটা অসম্ভব সুন্দর চাঁদ আজ আকাশে উঠেছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বালুতট। সেই আলোয় কিছু হাড়গোড়, চাপ চাপ মাংস আর দলা দলা রক্ত যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল...

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আগমনী ১৪৩৩

গল্প ৩

বাঘ বন্দী খেলা

আবীর গুপ্ত



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

(এক)

বক্সা টাইগার রিজার্ভে কি সত্যিই বাঘ আছে? ১৯৯০ সাল বা ওই সময়ে বনদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২৫-২৬টি বাঘ ছিল। বনদপ্তরের ক্যামেরা ট্র্যাপে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইস্ট দামানপুর রেঞ্জে ধরা পড়ে একটা পুরুষ বাঘ। এরপর দু'বছর বাদে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে, সেই ক্যামেরা ট্র্যাপেই ধরা পড়েছিল একটি বাঘ নদী ক্রস করছে। নদীতে জল না থাকায় বাঘটিকে দূর থেকে হলেও পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল। তাহলে কি বক্সাতে আবার বাঘ ফেরত এসেছে? নাকি অন্য জায়গা থেকে এখানে চলে এসেছিল, নিজের জায়গায় ফেরত যাওয়ার সময় ক্যামেরা ট্র্যাপে তার ছবি উঠেছে? এই নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং তা চলতেই থাকবে যতদিন না পর্যন্ত ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় উঠে আসে বাঘের ছবি— এরকমই বক্তব্য বেশ কিছু মানুষের।

বনদপ্তরের গাড়ি পাওয়া যায়নি বলে একটা প্রাইভেট জিপসি ভাড়া করে সৌরভ জঙ্গলে ঢুকেছে। গত সাত দিন ধরে অবশ্য বনদপ্তরের গাড়িতেই জঙ্গলে ঢুকেছিল, কিন্তু আজ ওদের কী একটা অসুবিধা থাকায় গাড়ি পাওয়া যায়নি। সৌরভের পাশে সিটের উপর রাখা আছে হাই-পাওয়ার জুম-লেন্স লাগানো মিররলেস ক্যামেরাটা। অত্যন্ত ভারী বলে ওটাকে ও সিটের উপরেই পাশে রাখে, যাতে দরকারমতো হাতে তুলে নেওয়া যায়। ওর সতর্ক চোখ দূরে অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা চলে এল হাতে। জিপসি ড্রাইভারও দেখতে পেয়েছে, তাই গাড়ির গতি স্লো করে দিয়েছে। পাহাড়ি রাস্তা, সোজা খানিকটা এগিয়ে রাস্তা ডান দিকে ঘুরে গেছে। ঘন জঙ্গল আর ডান দিকের রাস্তার আগে একটা ছোট্ট টিলার মতো অংশ থাকায় ওই রাস্তায় কিছু আছে কিনা বোঝা সম্ভব নয়। একটা চিতল হরিণ, সম্ভবত কিশোর, কারণ শিং এখনও সেভাবে গজায়নি, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভয় ভয় চোখে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

সৌরভ ক্যামেরাতে হরিণটার ছবি তুলছে, তবে খুব যে একটা উৎসাহভরে তা কিন্তু নয়। হঠাৎ ওর হাতটা এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেই স্টেডি হয়ে গেল। কন্টিনিউয়াস শুটিং মোডে প্রতি সেকেন্ডে ১৫টা করে ছবি উঠেই যাচ্ছে, কারণ যা দেখছে তা অবিশ্বাস্য! একটা বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হরিণটার উপর। হরিণটা বাঁচার জন্য লড়াই করছে, কিন্তু পারবে কেন? বাঘটা এক ঝটকায় হরিণটাকে মাটিতে ফেলে গলা কামড়ে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিতেই লড়াই শেষ।

এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! হঠাৎ ডানদিকের রাস্তা থেকে ওখানে চলে এল একদঙ্গল বাঘ! একটা-দুটো নয়, দশটা! অসম্ভব! বাঘেরা এভাবে একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে থাকে না, এটা ওদের স্বভাববিরুদ্ধ। হঠাৎ বাঘগুলো জিপসিটাকে দেখতে পেয়ে অন্য বাঘ আর শিকার করা হরিণকে পেরিয়ে চলে এলো জিপসির সামনে। জিপসির চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছে! হুড খোলা জিপসি, তাই সৌরভ একটু আতঙ্কিত, যদি অ্যাটাক করে? খেয়াল করল দশটা বাঘই চারপাশ থেকে জিপসিটাকে ঘিরে ফেলেছে। ড্রাইভার আর গাইড দুজনেই বেশ ভয় পেয়েছে। সৌরভ এটা বুঝতে পারল গাইডকে কাঁপা কাঁপা গলায় ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে বলাতে। হর্নের আওয়াজ শোনা মাত্র ওরা খেপে গেল, একটা বাঘ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির বনেটের উপর। সৌরভ তখনও ছবি তুলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা বাঘ লাফ দিয়ে গাড়ির পিছনের সিটে উঠে পড়ল, সৌরভ ভয় পেয়ে গাড়ির ড্রাইভারের সিট আর তার পাশে বসা গাইডের মাঝের অংশে চেষ্টা করল ঢুকে পড়তে। বাঁচার শেষ চেষ্টা। আর তারপর?

(দুই)

সৌরভ চক্রবর্তী পেশায় জুলজিস্ট, বয়স ত্রিশ বছর, বিয়ে করেনি এবং একটা সরকারি অফিসে চাকরি করে। ওর হবি ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি। মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে, চলে যায় কোনও রিজার্ভ ফরেস্টে, দিন কয়েক কাটিয়ে ছবি টবি তুলে ফেরত আসে। অফিস থেকে এই কারণে এমন সব প্রোজেক্ট নেয়, যেখানে চুটিয়ে ফটোগ্রাফি করতে পারবে, আবার প্রাণীদের উপর গবেষণাও করা যাবে। কয়েক মাস আগে কর্বেট ন্যাশনাল পার্কে বাঘেদের অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করার পর তা থেকে ধরে ফেলেছিল পাকিস্তানি জঙ্গিদের ষড়যন্ত্র। বক্সা টাইগার রিজার্ভে সত্যি সত্যিই বাঘ আছে কিনা তাই নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। বনদপ্তরের বক্তব্য, ওখানে বাঘ আছে। অনেকেই সেটা মানতে চায় না। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কেউ একজন অভিযোগ করার মিনিস্ট্রি থেকে সৌরভদের অফিসকে এই নিয়ে একটা ডিটেইল রিপোর্ট জমা দিতে বলে এবং সেই সঙ্গে একটা প্রোজেক্টও নিতে বলে। অফিস থেকে সৌরভকেই এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। সৌরভও দারুণ খুশি হয়, কারণ এই রকম দায়িত্ব পালন করতেই তো ও চায়, যেখানে ফটোগ্রাফিও করা যাবে।

গত সাত দিন ধরে রোজ দুবেলা বনদপ্তরের গাড়িতে জঙ্গলের নানান প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে পায়নি। লেপার্ডের পায়ের ছাপ পেলেও লেপার্ড দেখতে পায়নি। সাধারণত জঙ্গলের যেসব জায়গায় বাঘ থাকে, লেপার্ডরা সেই সব অঞ্চল এড়িয়ে চলে, কারণ বাঘ লেপার্ডদের দেখতে পেলেই তেড়ে গিয়ে অ্যাটাক করে। এই জঙ্গলে বাঘ সেরকম নেই, তাও লেপার্ডদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন! লুকিয়ে থাকছে কেন! এটা সৌরভকে ভাবিয়ে তুলল।

বনদপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটা জায়গায় যাবে বলে ঠিক করল, যেটা বেশ দুর্গম এবং নন-ট্যুরিজম এরিয়া শুধু নয়, বনদপ্তরের কর্মীরাও ওখানে প্রায় যায় না বললেই চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে সকালবেলায় জানতে পারল বনদপ্তরের জিপটা খারাপ হয়ে গেছে। তার বদলে অবশ্য ওঁরা ওকে একটা সাফারি জিপসিতে জঙ্গলে পাঠাবেন। সকালবেলায় যখন রওনা দিল, তখন স্বপ্নেও ভাবেনি ওর জন্য কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে আছে। এরপরের ঘটনা আগেই বলা হয়েছে।

(তিন)

বাঘটা পিছনের সিট থেকে মাঝের সিট অর্থাৎ জিপসি ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সিটে আসার চেষ্টা করছে আর সেই দেখে সৌরভও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে, কারণ বাঘটা থাবা চালালে সৌরভের গায়ে লাগবে। বাঘের বিশাল বড় ভয়ঙ্কর মাথাটা ফুট তিনেক দূরে। ভয়ংকর এক গর্জনে সৌরভের মতো সাহসী ছেলেরও বুক কেঁপে উঠল, ধরেই নিল বেঁচে ফিরলেও সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। ড্রাইভার সমানে জিপসির হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছে, গাইড মুখ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করছে, হঠাৎ বাঘটা থমকে গেল! একদম চুপ করে গেল! কয়েক সেকেন্ড নাকি কয়েক মিনিট! সৌরভের

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মনে হচ্ছিল এক যুগ। বাঘটা লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল আর তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল! সৌরভ শুধু নয়, সঙ্গের বাকি দুজনও অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি ঘিরে থাকা বাঘগুলোও ওই বাঘটির সঙ্গে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে!

গাইডই প্রথম কথা বলল—

এ কী! সব ভ্যানিশ! কী করে!

যেখানে হরিণটি মরে পড়ে আছে সেটা অতিক্রম করে ডানদিকে যে রাস্তা ঘুরে গেছে, সেখান থেকে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, ওদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন—

হাই জেন্টলম্যান, হাইলি সারপ্রাইজড্?

তারপর হাসতে হাসতে সামনে এসে বললেন—

এটা একটা ম্যাজিক ছিল। অবাক হয়েছেন? হওয়ারই কথা। এরকম ম্যাজিক আপনাদের পিসি সরকার সাহেবও দেখাতে পারবেন না।

সৌরভ বেশ অবাক হয়েই বলল—

কিন্তু, কীভাবে এটা সম্ভব?

সম্মোহন বিদ্যা। সেটাকেই উন্নতি করা হয়েছে।

কিন্তু, চিতল হরিণটাকে যে শিকার করল! ওটা তো মাটিতে পড়ে আছে!

ওটাকে আগে একটা লেপার্ড শিকার করেছিল। ঘণ্টাখানেক আগে দেখতে পেয়ে লেপার্ডটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আপনাদের দেখে ভাবলাম একটু মজা করি। বাকিটা সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে করেছি। চলুন আপনাদের আমার আস্তানায় নিয়ে যাই। ওখানে গিয়েই বাকি কথা হবে।

সৌরভ বলতে বাধ্য হলো—

স্যরি স্যার, আজ যেতে পারব না। আমি একটা টার্গেট নিয়ে বেরিয়েছি, সেটা কমপ্লিট না হলে অফিসকে কী জবাব দেবো?

যেতে তো হবেই। না গেলে ভয়ানক ঝামেলায় পড়ে যাবেন। প্রাণও যেতে পারে। অফিস আগে নাকি প্রাণ আগে?

আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন!

না। সাবধান করছি। এবারে আপনারা যা ঠিক করবেন।

গাইড ভদ্রলোক সৌরভকে বললেন—

স্যার, আমি ওঁকে চিনি, আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেই চাকরি করতেন। বছর দশেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কী সব বিজনেস করছেন। দশ বছর বাদে দেখা তো তাই চিনতে পারিনি। আমার মনে হয় যাওয়াই ভালো।

গাইডকে পিছনে পাঠিয়ে দিয়ে উনি সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে কীভাবে যেতে হবে বলতে শুরু করলেন।

(চার)

সৌরভের অদ্ভুত লাগছিল, এতগুলো ছবি তুলল সব বেকার হয়ে গেল! যদি সম্মোহন বিদ্যায় বাঘ দেখিয়ে থাকেন, তাহলে এতগুলো ছবি তুলেছে সব ওর মনের ভুল! কী সাংঘাতিক ম্যাজিক! এই কারণেই উনি বলেছেন জাদু সম্রাট পিসি সরকারও এটা পারবেন না। মন খারাপ করে ক্যামেরা অন করে ডিসপ্লেতে রিভিউ বাটন অন করে আগে তোলা ছবিগুলো দেখতে গিয়ে চমকে উঠল, এ কী! প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। ছবি এনলার্জ করে দেখাও শুরু করল। ওর ক্যামেরার ডিসপ্লে টাচ স্ক্রিন। তাই দুই আঙুলে প্রতিটি ছবি এনলার্জ করে করে খুঁটিয়ে দেখতে হচ্ছিল।

ভদ্রলোক ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেই চলেছেন, কী বলছেন তা ওর শোনার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। হঠাৎ গাড়িটা থেমে যেতেই ওর সম্বিত ফিরল। একটা বিশাল বড় ভাঙাচোরা বাড়ি, যার একদিকে কিছুটা সারিয়ে নেওয়া হয়েছে, গাড়ি ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা পাহাড়ের চূড়ায়, উপর থেকে নিচের উপত্যকা, জঙ্গল সব দেখা যাচ্ছে। দুর্গের স্টাইলে তৈরি বাড়িটা। সৌরভের



দেখে মনে হচ্ছিল এই বাড়িটা অতীতে সম্ভবত কেল্লা বা কেল্লার কোনও অংশ ছিল। হয়তো বক্সার বিখ্যাত ফোর্ট বা দুর্গের একটি অংশ এই বাড়ি, যা পরিত্যক্ত ছিল, সারিয়ে বাসোপযোগী করে নেওয়া হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোক বললেন—

নেমে আসুন। ওয়েলকাম টু মাই হোম। আপনাদের সবার নাম, ধাম, গোত্র সবই আমি জানি। তাই, শুধু আমার নিজের পরিচয়টাই দিচ্ছি। আমার নাম ইন্দ্রনীল ঘোষ। আগে বনদপ্তরে চাকরি করতাম। বছর দশেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে বসবাস করছি। আমার পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন বিপ্লবী। ১৮৭৩ সালে ব্রিটিশরা বক্সা ফোর্ট তৈরি করে। আন্দামানের সেলুলার জেলে যে সব বন্দিদের পাঠানো সম্ভব হতো না, তাদের রাখা হতো এখানে। সে সময় এখানে পৌঁছানোর কথা কিংবা এখান থেকে পালানো ছিল অসম্ভব, কারণ এতটাই দুর্গম ছিল পথ। আমার ঠাকুর্দার শেষ জীবনটা কেটেছে এই জেলে। এখানে পাঠানোর পর আর কোনওদিন তার কোনও খবর কেউ পায়নি। এখানকার প্রতিটি ইটে, জমিতে আমি ঠাকুর্দার আর্তনাদ শুনতে পাই। তাই সুযোগ পেয়ে জায়গাটা কিনে ফেলি আর কিছুটা সারিয়ে এখানেই থাকা শুরু করি। আসুন ভেতরটা দেখুন। সেলুলার জেল থেকেও এই জেল কতটা ভয়ানক ছিল তা বুঝতে পারবেন।

সৌরভ একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল—

এটা কী করে বক্সা ফোর্ট হয়! ওটা তো অন্য পাহাড়ের চূড়ায়। এটা ওর কোনও অংশ হতে পারে।

একদম ঠিক বলেছেন। এটা বক্সা ফোর্টেরই একটা অংশ। যেসব কয়েদিকে ব্রিটিশরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেনি, কিন্তু মেরে ফেলতে চাইতো, তাদেরকে পাঠিয়ে দিত এইখানে। আরও অনেক বেশি দুর্গম জায়গায় বলে কেউ কোনওদিন এটার খবরই পায়নি। একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, আমি আমার মত করে কাজে লাগাতে পারছি। অনেক গল্প হয়েছে, এবারে ভালো দার্জিলিং টি খেতে খেতে কথা হবে।

সৌরভ ওই দুর্গে ঢোকার আগে চার-পাঁচটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, মনে মনে ভাবছিল কীভাবে ড্রাইভারকে বলবে যাতে সুযোগ পেলেই পালানো যায়। ইন্দ্রনীল ঘোষ বোধহয় মনের কথা বুঝতে পারেন, বললেন—

আপনি কি পালানোর কথা ভাবছেন? ভুলেও ভাববেন না, মৃত্যু অবধারিত। গাইড আর ড্রাইভার আমারই লোক। বনদপ্তরের ঝামেলা টামেলাগুলো ওখানে থেকে সামলায়, অবশ্যই আমার পরামর্শ নিয়ে। তিন জনের বিরুদ্ধে আপনি একা। এছাড়াও আমার পোষা বাঘেরা তো আছেই। আমার নির্দেশ পেলে আপনাকে মেরে ফেলবে। গাড়িতে বসে আয়নায় দেখছিলাম আপনি ক্যামেরায় আপনার তোলা ছবিগুলো দেখছিলেন। সেসময়ে আপনার চোখ-মুখের ভঙ্গি বলে দিচ্ছিল আপনি সবটা না বুঝলেও কিছুটা অনুমান করেছেন। আসুন বসে চা খেতে খেতে সবটা বুঝিয়ে বলছি।

(পাঁচ)

ইন্দ্রনীল ঘোষ বলছিলেন—

বছর ১৪-১৫ আগে নোটিশ করি বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র দুটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন যেহেতু বনদপ্তরের চাকরি করি, তাই কিছুই করার উপায় ছিল না। তখনই ঠিক করি বাঘেদের নিয়ে কিছু একটা করব। এরপর বছর দশেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই জায়গাটা কিনে চলে আসি। এখান থেকেই শুরু করি বাঘেদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা। সেই সঙ্গে আমার হাতে আসে এমন একটা যন্ত্র, যা দিয়ে যখন ইচ্ছা বাঘেদের অদৃশ্য করে দেওয়া যায়। তখন আপনাকে বলেছিলাম সম্মোহন বিদ্যার কথা। বানিয়ে বলেছিলাম। আসল সত্যি এটাই। আপনাকে আমার পোষা বাঘেদের সঙ্গে পরিচয় করানো দরকার। চলুন, ভালো লাগবে। আপনি একজন বন্যপ্রাণী প্রেমিক, তাই গুরুত্বটা বুঝতে পারবেন।

পিরিয়ডে যে ছোট্ট খুপরি বা সেলগুলোতে ব্রিটিশরা ভারতীয় বিপ্লবীদের রাখত, এখন সেখানে প্রতিটি সেলে রয়েছে একটি করে বাঘ। লোহার মোটা মোটা রডের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাঘগুলোকে দেখতে দেখতে সৌরভ ভাবছিল বিপ্লবীদের কথা। সত্যি সত্যিই ওঁরাও তো বাঘই ছিলেন। বাঘের মতন সাহস আর শৈর্য নিয়ে লড়াই করে গেছেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। কোনও বাঘের মধ্যেই কোনওরকম অশান্ত মনোভাব দেখতে পেল না, প্রত্যেকেই শান্তভাবে নিজের নিজের ঘরে বসে আছে। যেন সুশৃঙ্খল সৈন্য! জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল জেল হাজতে থাকা মোট বাঘের সংখ্যা পঞ্চাশ। কখনওই একসঙ্গে সব বাঘকে বাইরে ছাড়েন না, খুব বেশি হলে ১০-১২টা বাঘকে একসঙ্গে ঘুরতে পাঠান। এর কারণ নাকি চোরা শিকারি। ওরা একসঙ্গে এতগুলো বাঘকে দেখতে পেলে মেরে ফেলবে, কারণ বাঘের চামড়ার ডিমান্ড নাকি সাংঘাতিক।

সৌরভ বাঘেদের দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল—

এই বাঘগুলো বেশ বড় মাপের! আমি ভারতের নানান প্রান্তে এত বাঘ দেখেছি, কিন্তু এত বড় বাঘ দেখিনি। এদেরকে কোথা থেকে আনিয়েছেন?

আনাবো কেন! সব বক্সার বাঘ। এখানেই ওদের জন্ম হয়েছে।

তাই নাকি! কিন্তু, সব বাঘগুলোর আয়তন মোটামুটি একই! তাছাড়া কোনও বাচ্চা বা সাব-অ্যাডাল্ট দেখলাম না।

আছে। ওদেরকে আলাদা রাখা হয়েছে।

দেখা যাবে?

এখন নয়। অন্য জায়গায় রয়েছে। সবই দেখালাম। আমার একজন আপনার মতন শিক্ষিত বিজ্ঞানী দরকার। জয়েন করবেন?

কী করতে হবে? সেটা না জানলে—।

পরে বুঝিয়ে দেব। আপাতত আপনাকে আপনার থাকার জায়গা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

(ছয়)

জেলে কয়েদিদের থাকার জন্য ঘরের একটা ঘর সৌরভকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তবে ঘরটা বড়, মনে হয় ৩-৪ জন কয়েদিকে রাখা হতো। সৌরভ ঘরে ঢোকা মাত্রই বাইরের লোহার গ্রিলের গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। অর্থাৎ, সৌরভও একজন কয়েদি। সৌরভ একটা জিনিস বুঝতে পারছিল, ইন্দ্রনীল ঘোষ এখন অবধি যা যা সৌরভকে বলেছেন, তার কোনও কথা সত্যি নয়। অনেক কিছুই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে করণীয় কিছু নেই। শুধু এটুকু বুঝেছে, ইন্দ্রনীল ঘোষের কথায় তাল মিলিয়ে চললে আরও কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন বেঁচে থাকতে পারবে। আর তা না হলে যে ওকে বাঘেদের মুখে ঠেলে দেবেন, সে বিষয়ে ও নিশ্চিত। শুধু ওর একটাই খটকা মনের মধ্যে খোঁচা মারছে, সেটা হল ২০২১ বা ২০২৩ সালে যে বাঘ দুটিকে দেখা গিয়েছিল, সেটি কি এখানকার বাঘ অর্থাৎ ইন্দ্রনীল ঘোষের বাঘ, নাকি বাইরে অন্য জঙ্গল থেকে চলে আসা বাঘ? এটা ওকে জানতেই হবে।

ড্রাইভার ছেলেটি দুপুরের খাবার নিয়ে এলো। প্রায় খাওয়ার অযোগ্য খাবার। খিচুড়ি আর নানা রকম সবজির একটা ঘ্যাট। খাবার দিয়ে ছেলেটি বলল—

এখানে নন ভেজ পাবেন না। বাঘেদের জন্য অবশ্য হরিণ, সম্বর ধরে আনা হয়। চাইলে কাঁচা মাংস দিতে পারি।

সৌরভের মাথা গরম হলেও হেসে জিজ্ঞাসা করল—

এখানে চারপাশে, এই বিল্ডিংয়েই একটু হাঁটাচলা করা যাবে? আসলে এভাবে সারাক্ষণ বসে থাকা অসম্ভব। মস্তিষ্কও ঠিকভাবে কাজ করবে না।

স্যার যদি অনুমতি দেন তবেই যেতে পারবেন। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করব।

ড্রাইভার ছেলেটি খারাপ নয়, একটু বাদে এসে সৌরভকে বলল—

স্যারকে বলেছিলাম, কিন্তু উনি রাজি হচ্ছেন না। তবে বলেছেন বিল্ডিং-এর বাইরে যাওয়া চলবে না। ভিতরে ঘুরতে পারেন। ছাদে যদি যেতে হয়, তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। যখন যাবেন বলবেন, আমি সঙ্গে থাকব।

সৌরভ একটু ভেবে নিয়ে বলল—

তাহলে এখনই চলো। খাওয়া দাওয়ার পর একটু হাঁটাহাঁটি না করলে আমার আবার হজমে সমস্যা হয়।

সরু একটা সিঁড়ি দিয়ে ছাদে পৌঁছে সৌরভ বেশ অবাকই হলো, কারণ বিভিন্ন উচ্চতায় অনেকগুলো ছাদ এবং এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। উপরে ওয়াচ্ টাওয়ারও আছে। সৌরভ ব্যাগ থেকে স্মার্টফোনটা বার করে সুইচ অন করে জিজ্ঞাসা করল—

এখানে তো বোধহয় নেটওয়ার্ক আসে না, তোমরা দরকার হলে কী কর?

মান্ধাতার আমলের ব্যবস্থা। ব্রিটিশরা নিজেদের দুই ফোর্ট অর্থাৎ আসল ফোর্ট আর এই ফোর্টের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য টেলিগ্রাফ ব্যবহার করত। সেই টরে টক্কা শব্দের মাধ্যমে আমরাও জয়ন্তীতে খবর পাঠাই।

সৌরভ হেসে স্মার্টফোনটা চালু অবস্থায় ছাদের উপর রেখে ছেলেটিকে বলল—

উপরে আসার সময় জল খেয়ে আসতে ভুলে গেছি। ব্যাগের বোতলেও জল নেই। একটু জল খাওয়াবে?

ছেলেটি একটু ইতস্তত করে সৌরভের হাত থেকে জলের বোতলটা নিয়ে নিচে চলে যেতেই সৌরভ দ্রুত ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বার করে তার সঙ্গে লাগানো সরু মেটালের রডটাকে পুরো খুলে দিয়ে সাবধানে পাশের ছাদে রেখে আবার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ল।

(সাত)

সৌরভ নিচে নিজের ঘরে চলে এসেছে। যথারীতি বাইরে থেকে সেলের দরজা আটকে ছেলেটি চলে গেছে। সৌরভ কান খাড়া করে বাইরের প্রতিটি শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। দূরে মৃদু একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেল। এর মিনিট চল্লিশেক বাদে রীতিমতো গুলি বর্ষণের আওয়াজ শুরু হলো। এরপর সব চুপচাপ। হঠাৎ বাইরে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দেখল বিএসএফ-এর একজন অফিসার এসে দাঁড়িয়ে সৌরভকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলেন—

আপনি ড. সৌরভ চক্রবর্তী?

সৌরভ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই উনি দরজা খুলে বললেন—

অনেক ধন্যবাদ। আপনি একজন সায়েন্টিস্ট হয়েও দেশের জন্য যা করেছেন, তা কেউ করবে না। চলুন যাওয়া যাক।

সৌরভ নিচে নেমে দেখল প্রায় জনা চল্লিশেক ইন্ডিয়ান আর্মি আর বিএসএফ-এর জওয়ান পুরো জায়গাটা ঘিরে আছে। ইন্দ্রনীল ঘোষ, ড্রাইভার আর গাইডকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে একধারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সৌরভকে দেখেই ইন্দ্রনীল ঘোষ একটা কুৎসিত গালাগাল দিলেন। সৌরভ হেসে বলল—

আমাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বললেও আমি সত্যি কথাটাই আপনাকে বলব। সত্যি কথাটা না জানতে পারলে জেলে বসেও যে শান্তি পাবেন না। পুরোটা প্রথম থেকে খুলে বলছি। ঘটনার সূত্র-পাত কর্বেট ন্যাশনাল পার্কে সন্ত্রাসবাদীদের ধরার পর। সিবিআই থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। গত ৭-৮ বছর ধরে বক্সায় বাঘের অনুপস্থিতি যেমন পরিবেশবিদদের চিন্তায় ফেলেছিল, তেমনই ভারত সরকারের সন্দেহ হচ্ছিল, হয়তো চোরা শিকারিরা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

এখানে ভীষণভাবে সক্রিয়। তাও হয়তো ওঁরা মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের পূর্ব ভারতে আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় ওঁরা নড়েচড়ে বসলেন। ওঁদের গোয়েন্দাদের কাছে খবর এলো, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে ঢুকছে। কিন্তু, এখানে গোয়েন্দারা বা আর্মি ঢুকবে কী করে? পরিবেশ নষ্ট হবে যে। তাই তৈরি হলো মাস্টারপ্ল্যান। আমাকে দায়িত্ব নিতে বলা হলো। হ্যাঁ, প্রাণের রিস্ক ছিল, কিন্তু যা করেছি দেশের জন্য। বক্সায় বাঘের উপস্থিতি প্রমাণ করার নাম করে অফিসের থেকে একটা প্রোজেক্ট নেওয়া হল। এটা মিনিস্ট্রি থেকে নিতে বলা হয়েছিল। ওই প্রোজেক্টের দায়িত্ব দেওয়া হল আমাকে। এখানে এসে নানা জায়গায় বনদপ্তরের গাড়িতে ঘোরা শুরু করলাম। বনদপ্তরের গাড়ির জায়গায় প্রাইভেট জিপসিতে যেতে হবে শুনেই অনুমান করে সিবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ওঁরা সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। গাড়ি বাঘেরা ঘিরে ফেলার পর সত্যিই আঁতকে উঠেছিলাম, কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর যখন বললেন সম্মোহন করেছিলেন, ম্যাজিক দেখিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করিনি। ক্যামেরায় ছবি দেখে বুঝলাম বাঘগুলো আসলে রোবট, কারণ ছবিতে মুখের ভিতর আর তলপেটে তার আর সুইচ রয়েছে। বিদেশি টেকনোলজি। সম্ভবত জঙ্গিদের মদতদাতা কোনও দেশ থেকে এই সব রোবো বাঘ আপনার এখানে আসছে। অদৃশ্য হওয়ার টেকনোলজি অবশ্যই যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার, এটা মেনে নিতেই হবে। বাকি সবটাই আপনি জানেন। ও হ্যাঁ, কী করে আমি এখানে এই খবরটা ওরা পেল? আমার ব্যাগে একটা ছোট্ট বাক্স ছিল। যেটার সুইচ অন করে ছাদে রেখে এসেছিলাম। ওর সঙ্গে লাগানো অ্যান্টেনার মারফত স্যাটেলাইট হয়ে সিগনাল গেল আর্মির কাছে। লোকেশনও পেয়ে গেলেন ওঁরা। ব্যাস, খেল খতম। হয়তো নিজেদের প্রয়োজনে অনেক সত্যিকারের বাঘকে আপনি হত্যা করেছেন, এখন আর তা হবে না। এতে বক্সায় আবার বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলেই আমার ধারণা।

সৌরভ হেলিকপ্টারে ওঠার সময় ইন্দ্রনীল ঘোষের গালাগালি আর শাসানি শুনতে শুনতে ভাবছিল, উনি কি জীবনে কোনওদিন প্রতি-শোধ নেওয়ার জন্য জেলের বাইরে আসতে পারবেন!



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আগমনী ১৪৩৩

গল্প ৪



গোধূলি শেষের সন্ধে তারা

আবীর গুপ্ত

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কলকাতার উপকণ্ঠে একটি আধুনিক আবাসনের অষ্টম তলায় সহিস বসু ও রঞ্জনা বসুর ফ্ল্যাট। চারদিকে আলো, সাজানো সংসার, বিলাসিতার অভাব নেই। বড় ড্রয়িংরুম, সুন্দর বারান্দা, আধুনিক আসবাবপত্র—সবই আছে। অথচ এই ঘরের ভেতরে এমন এক শূন্যতা বাসা বেঁধেছিল, যার কোনো শব্দ নেই, কোনো রং নেই, কিন্তু যার ভার প্রতিদিন অনুভব করত বাড়ির চারজন মানুষ। রাত সাড়ে নয়টা। অফিস থেকে ফিরে দরজা খুলতেই রঞ্জনা দেখল, ড্রয়িংরুমের টেলিভিশন চলছে, কিন্তু কেউ দেখছে না। সোফার কোণে অলক বসু চুপচাপ বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন। মৃন্ময়ী দেবী নিজের ঘরে বসে পুরনো অ্যালবাম দেখছেন। রঞ্জনার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কতদিন ধরে সে এই দৃশ্য দেখে আসছে! রাতের খাবার খাওয়ার সময় সে হঠাৎ সহিসকে বলল, — "তোমার কি কখনও মনে হয় না, আমরা চারজন এক বাড়িতে থেকেও চারটে আলাদা দ্বীপে বাস করছি?" সহিস থমকে গেল। — "মানে?" — "মানে বাবা-মা সারাদিন একা থাকে। আমরা সকাল আটটায় বেরোই, ফিরি কখনও নয়টায়, কখনও দশটায়। এই বিশাল ফ্ল্যাটে দুটো মানুষ শুধু সময় কাটায়।" সহিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। — "জানি। কিন্তু উপায়?" রঞ্জনা একটু চুপ করে থেকে বলল, — "সব সমস্যার সমাধান একই রকম হয় না।" — "তুমি কী বলতে চাইছ?" — "আমি একটা জায়গার কথা ভাবছি..." সহিস যেন আন্দাজ করে ফেলল। — "বৃদ্ধাশ্রম?" রঞ্জনা মাথা নিচু করল। ঘরের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত নীরবতা নেমে এল। কিছুক্ষণ পরে সহিস বলল, — "মানুষ কী বলবে জানো?" — "মানুষ কি এখন এসে তাদের সঙ্গে গল্প করে?" সহিস কোনো উত্তর দিতে পারল না। রঞ্জনা তার হাত ধরে বলল, — "আমি বাবা-মাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই না। আমি চাই তারা বাঁচুক।" সেদিন কথাটা সেখানেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু রঞ্জনার মনে সেই চিন্তার বীজ রোপিত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই একদিন গভীর রাতে রঞ্জনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সহিস পিছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। দশ বছরের বিবাহিত জীবন। সন্তান নেই। অসংখ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা, আশ্বাস, হতাশা—সবকিছু পেরিয়ে তারা একে অপরের হাত ছাড়েনি। রঞ্জনা মৃদু হেসে বলল, — "আমাদের যদি একটা সন্তান থাকত, তাহলে হয়তো বাবা-মার এত একা লাগত না।" সহিস তার কপালে চুমু খেল। — "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তুমি।" — "সব সময় এত নাটকীয় কথা বলো কেন?" — "কারণ সত্যিটা নাটকের থেকেও সুন্দর।" রঞ্জনার চোখ ভিজে উঠল। — "আমি মা হতে পারিনি।" সহিস সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটে আঙুল রাখল। — "আবার এই কথা?" — "কিন্তু সত্যি তো..." — "না। সত্যিটা হলো, তুমি আমার পৃথিবী।" কয়েক মুহূর্ত তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চাঁদের আলো যেন তাদের নীরবতাকে আশীর্বাদ করছিল। অন্যদিকে অলক বসু ও মৃন্ময়ী দেবীর জীবন যেন ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসছিল। সকালে খবরের কাগজ। দুপুরে টেলিভিশন। বিকেলে বারান্দা। রাতে অপেক্ষা। শুধু অপেক্ষা। কোনো কথা বলার মানুষ নেই। কোনো সমবয়সী বন্ধু নেই। কোনো আড্ডা নেই। একদিন মৃন্ময়ী দেবী হঠাৎ বললেন, — "শোনো, আমাদের সময়টা যেন থেমে গেছে।" অলকবাবু হাসলেন। — "সময় থামে না। আমরা পিছিয়ে পড়ি।" — "খুব একা লাগে।" — "আমারও।" দুজনেই আর কিছু বললেন না। কথাগুলো ঘরের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। তারপর এলো সেই দিন। হঠাৎ দুপুরে মৃন্ময়ী দেবীর শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। নমিতা আতঙ্কিত হয়ে ফোন করল। অফিস থেকে ছুটে এল সহিস ও রঞ্জনা। হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, — "হার্টে সমস্যা হয়েছে। পেসমেকার বসাতে হবে।" অপারেশনের আগের রাতে ডাক্তার মৃন্ময়ী দেবীর সঙ্গে একা কথা বলছিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, — "আপনার সবচেয়ে বড় কষ্ট কী?" মৃন্ময়ী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, — "বুকের অসুখের আগে মনটা অসুস্থ হয়েছে ডাক্তারবাবু।" — "কেন?" — "সারাদিন কথা বলার কেউ নেই।" ডাক্তার নীরবে শুনলেন। — "জানেন, কখনও কখনও মনে হয় আমি বেঁচে আছি না, শুধু সময় কাটাচ্ছি।" ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই উত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইয়ে লেখা থাকে না। অপারেশন সফল হলো। মৃন্ময়ী দেবী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু সেই ঘটনার পর সহিসের মনেও পরিবর্তন আসতে শুরু করল। এক রবিবার সকালে সে বলল, — "চলো, তোমাদের একটা জায়গা দেখাব।" অলকবাবু অবাক। — "কোথায়?" — "চমক।" গাড়ি চলতে লাগল শহরের বাইরে। সবুজ গাছপালা। পাখির ডাক। ছোট ছোট জলাশয়। নিরিবিলি রাস্তা। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তারা পৌঁছাল। বড় ফটকের ওপরে লেখা— "আনন্দের আশ্রম" মৃন্ময়ী দেবী নামটা পড়ে থমকে গেলেন। ভেতরে ঢুকে দেখলেন— কেউ গান গাইছে। কেউ দাবা খেলছে। কেউ বাগান করছে। কেউ কবিতা আবৃত্তি করছে। কারও মুখে বিষণ্ণতা নেই। বরং এক অদ্ভুত প্রশান্তি। এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে বললেন, — "নতুন এসেছেন?" মৃন্ময়ী দেবী হেসে ফেললেন। কতদিন পরে এমন করে কেউ কথা বলল! অলকবাবুও দেখলেন কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আড্ডা দিচ্ছেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস নিয়ে তর্ক চলছে। তার চোখে যেন হঠাৎ পুরনো উজ্জ্বলতা ফিরে এল। ফেরার পথে গাড়িতে কেউ কথা বলছিল না। কিন্তু সেই নীরবতার ভেতরে চিন্তার ঢেউ উঠছিল। রাতে অলকবাবুই প্রথম বললেন, — "আমি যেতে চাই।" সহিস চমকে উঠল। — "বাবা!" — "হ্যাঁ।" মৃন্ময়ী দেবীও বললেন, — "আমিও।" রঞ্জনার চোখ ভিজে উঠল। — "তোমরা কি আমাদের ওপর রাগ করনি?" মৃন্ময়ী দেবী উঠে এসে রঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরলেন। — "পাগলি মেয়ে, তুমি আমাদের দূরে পাঠাচ্ছ না। তুমি আমাদের আবার মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে দিচ্ছ।" সেই মুহূর্তে চারজনের চোখেই জল। কিন্তু সেই জল দুঃখের ছিল না। সেটা ছিল বোঝাপড়ার। ভালোবাসার। এবং এক নতুন যাত্রার সূচনার। তখনও কেউ জানত না, "আনন্দের আশ্রম" শুধু অলক ও মৃন্ময়ীর জীবনের নয়, সহিস ও রঞ্জনার জীবনকেও এমনভাবে বদলে দেবে, যা তারা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। আর সেই পরিবর্তনের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এক বেদনাময় অথচ আনন্দঘন সুপারক্লাইম্যাক্স—যা একদিন এই বৃদ্ধাশ্রমকে সত্যিই "আনন্দের আশ্রম" করে তুলবে। আনন্দের আশ্রমে আসার পর প্রথম কয়েকদিন অলক বসু ও মৃন্ময়ী বসুর মনে এক অদ্ভুত দ্বিধা কাজ করছিল। একদিকে নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন জীবনযাত্রা—অন্যদিকে এত বছরের পরিচিত ঘর, নিজের ফ্ল্যাট, নিজের বারান্দা, নিজের স্মৃতিগুলো। তবুও মানুষ বড় আশ্চর্য প্রাণী। যেখানে ভালোবাসা ও সঙ্গ মেলে, সেখানে সে ধীরে ধীরে শিকড় গজিয়ে নিতে পারে। প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃন্ময়ী দেবী আবিষ্কার করলেন, এখানে তাঁর মতো আরও অনেক মানুষ আছেন। কেউ অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষিকা। কেউ ডাক্তার। কেউ অধ্যাপক। কেউ আবার একসময়ের বিখ্যাত নাট্যকর্মী। প্রতিদিন সকালে বাগানের পাশে চায়ের আড্ডা বসত। সেখানে গল্প হতো—রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ, ফুটবল থেকে দর্শন, রান্না থেকে প্রেম। হ্যাঁ, প্রেমও। একদিন আড্ডায় সবাই হেসে উঠেছিল। কারণ আশ্রমের সবচেয়ে প্রবীণ বাসিন্দা, আশি বছরের অরুণবাবু ঘোষণা করেছিলেন— — "বয়স বাড়ে শরীরের, হৃদয়ের নয়।" মৃন্ময়ী দেবী হেসে

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বলেছিলেন, — "তা হলে প্রেম করার পরিকল্পনা আছে নাকি?" — "পরিকল্পনা নয়, সম্ভাবনা।" আবার হাসির রোল উঠেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরে মৃন্ময়ী দেবী অলকবাবুকে বললেন, — "শুনছো, কতদিন পরে এত হাসলাম জানো?" অলকবাবু বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তার চোখেও যেন নতুন আলো। — "আমিও।" — "এখানে আসাটা ভুল হয়নি।" — "বরং অনেক দেরি হয়ে গেছে।" দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মৃন্ময়ী ধীরে বললেন, — "রঞ্জনা না থাকলে আমরা কোনোদিন এই সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম?" অলকবাবু মাথা নাড়লেন। — "না।" — "মেয়েটা আমাদের নিজের মেয়ের থেকেও বেশি।" অলকবাবুর চোখে জল এসে গেল। — "ঈশ্বর ওদের সুখী রাখুন।" এদিকে রঞ্জনা ও সহিসও পরিবর্তন অনুভব করছিল। বাড়িতে ফিরে এখন আর বুকের ভেতর অপরাধবোধ কাজ করত না। বরং সপ্তাহে দুইদিন তারা আনন্দের আশ্রমে যেত। কখনও ফল নিয়ে। কখনও বই নিয়ে। কখনও শুধু সময় নিয়ে। এক রবিবারে রঞ্জনা অবাক হয়ে দেখল—মৃন্ময়ী দেবী পাঁচজন মহিলার সঙ্গে বসে গান গাইছেন। অলকবাবু দাবার বোর্ডে কারও সঙ্গে ভীষণ তর্ক করছেন। সেই দৃশ্য দেখে রঞ্জনার চোখ ভিজে উঠল। সহিস পাশে দাঁড়িয়ে বলল, — "এখন বুঝতে পারছ?" — "কি?" — "তুমি ঠিক ছিলে।" রঞ্জনা মৃদু হেসে বলল, — "আমরা ঠিক ছিলাম।" সহিস তার হাত ধরে ফেলল। — "হ্যাঁ, আমরা।" কিন্তু জীবনের বড় গল্পগুলো কখনও সরলরেখায় চলে না। একদিন বিকেলে আশ্রমের লাইব্রেরিতে অলকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো এক ভদ্রলোকের। নাম— প্রদীপ সেন। বয়স বাহাত্তর। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সুদর্শন, মার্জিত, এবং অদ্ভুত রকম প্রাণবন্ত। কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একদিন আড্ডার ফাঁকে প্রদীপবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, — "আপনার ছেলে-মেয়ে কয়জন?" অলকবাবু একটু থামলেন। — "এক ছেলে।" — "নাতি-নাতনি?" অলকবাবুর মুখের হাসি ম্লান হয়ে গেল। — "না।" প্রদীপবাবু আর কিছু বললেন না। কিন্তু তিনি বুঝলেন। এই উত্তরটির মধ্যে বহু বছরের না-পাওয়ার বেদনা লুকিয়ে আছে। সেই রাতে আশ্রমের ছাদে বসে অলকবাবু দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মৃন্ময়ী পাশে এসে বসলেন। — "কী ভাবছ?" — "সহিসদের কথা।" — "আমিও ভাবি।" — "বাইরে যতই হাসি, একটা কষ্ট তো রয়েই গেছে।" মৃন্ময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। — "সন্তান না হওয়ার কষ্ট?" — "হ্যাঁ।" — "আমারও হয়।" কিছুক্ষণ নীরবতা। দূরে রাতের আকাশে একটি উল্কা ছুটে গেল। মৃন্ময়ী হঠাৎ বললেন, — "কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় ঈশ্বর হয়তো অন্য কিছু ভেবে রেখেছেন।" অলকবাবু মৃদু হেসে বললেন, — "তুমি এখনও এত বিশ্বাস করো?" — "করতেই হয়। না হলে বাঁচব কী নিয়ে?" পরের কয়েক মাসে আনন্দের আশ্রম যেন তাদের দ্বিতীয় পরিবার হয়ে উঠল। মৃন্ময়ী দেবী শুরু করলেন একটি পাঠচক্র। অলকবাবু শুরু করলেন দাবা প্রশিক্ষণ। নতুন নতুন মানুষ যুক্ত হতে লাগল। আশ্রমের পরিচালক পর্যন্ত অবাক হয়ে বললেন— — "আপনারা আসার পর পুরো পরিবেশ বদলে গেছে।" কিন্তু তখনও কেউ জানত না, ভাগ্য আরেকটি বিস্ময় লুকিয়ে রেখেছে। এক বর্ষার দুপুরে রঞ্জনা আশ্রমে এসেছিল। প্রবল বৃষ্টি। আকাশ কালো। ঠিক তখনই গেটের সামনে একটি গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে নামলেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। তার সঙ্গে একটি সাত-আট বছরের ছোট মেয়ে। মেয়েটির চোখ দুটি অদ্ভুত উজ্জ্বল। কিন্তু মুখে বিষণ্ণতা। রঞ্জনা দূর থেকে দেখছিল। মহিলাটি আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বললেন। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেলেন। রঞ্জনার কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। সে জানত না কেন। শুধু মনে হচ্ছিল—এই শিশুটির সঙ্গে জীবনের কোনো এক অদৃশ্য সম্পর্ক আছে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে সহিসকে সে বলল, — "আজ একটা মেয়েকে দেখলাম।" — "তারপর?" — "জানি না কেন, মনে হলো ও খুব একা।" সহিস মৃদু হেসে বলল, — "তুমি সবসময় সবাইকে নিয়ে ভাবো।" — "হয়তো।" — "তবু?" — "তবু মনে হচ্ছে ও আবার আমাদের জীবনে আসবে।" সহিস মজা করে বলল, — "তুমি কি এখন ভবিষ্যদ্বক্তা হয়ে গেলে?" রঞ্জনা হেসে ফেলল। কিন্তু তার বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা আলোড়ন রয়ে গেল। সে জানত না— সেই ছোট্ট মেয়েটিই একদিন তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায় হয়ে উঠবে। আর আনন্দের আশ্রম, যা শুরু হয়েছিল দুই বৃদ্ধ মানুষের নিঃসঙ্গতা দূর করার উদ্দেশ্যে, ধীরে ধীরে পরিণত হবে এমন এক পরিবারের জন্মস্থানে—যেখানে রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে ভালোবাসা। বর্ষা তখন পুরোদমে নেমেছে। আনন্দের আশ্রমের চারপাশের কৃষ্ণচূড়া, আম, শিরীষ আর কদমগাছ বৃষ্টির জলে ধুয়ে আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। সেই বৃষ্টিভেজা বিকেলে দেখা ছোট্ট মেয়েটির মুখটা রঞ্জনার মন থেকে কিছুতেই মুছে যাচ্ছিল না। কাজের ফাঁকে, মিটিংয়ের মাঝখানে, এমনকি গভীর রাতেও সেই দুটো বড় বড় চোখ যেন তাকে অনুসরণ করত। একদিন সহিস মজা করে বলল, — "তোমার মনে হচ্ছে না তুমি একটু বেশিই ভাবছ?" রঞ্জনা জানলার বাইরে তাকিয়ে বলল, — "জানো, কখনও কখনও কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয় যেন বহুদিনের পরিচিত।" — "তুমি তো ওদের চিনতেই না।" — "হয়তো মন চিনেছিল।" সহিস হেসে মাথা নাড়ল। কিন্তু সে জানত, রঞ্জনার অনুভূতিকে অবহেলা করা যায় না। পরের রবিবার তারা আনন্দের আশ্রমে গেল। অলকবাবু তখন বাগানের নতুন গাছ নিয়ে ব্যস্ত। মৃন্ময়ী দেবী কয়েকজন বৃদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের মহড়া করছেন। ঠিক সেই সময় রঞ্জনা দেখল, আশ্রমের অফিস কক্ষের সামনে আবার সেই ছোট্ট মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা পুরনো পুতুল। মাথা নিচু। চোখে একরাশ বিষণ্ণতা। রঞ্জনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। — "তোমার নাম কী মা?" মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বলল, — "অন্বেষা।" — "বাহ, কী সুন্দর নাম।" — "আমাকে সবাই অনু বলে ডাকে।" রঞ্জনা মৃদু হেসে বলল, — "আমি কি তোমাকে অনু বলে ডাকতে পারি?" মেয়েটি প্রথমবারের মতো একটু হাসল। সেই হাসি যেন মেঘের আড়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা রোদ। ঠিক তখনই আশ্রমের পরিচালক অরূপবাবু সেখানে এসে দাঁড়ালেন। রঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, — "ও এখানে কেন আসে?" অরূপবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে বললেন, — "এটা একটু দীর্ঘ গল্প।" বিকেলে আশ্রমের লাইব্রেরিতে বসে তিনি গল্পটা বললেন। অন্বেষার বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। সীমান্তে এক দুর্ঘটনায় মারা যান। তার কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যান্সারে মারা যান অন্বেষার মা। তারপর থেকে শিশুটির দায়িত্ব নেন তার মামি। কিন্তু মামির নিজের সংসারও ভেঙে পড়েছিল। অর্থনৈতিক সংকট, অসুস্থতা, অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। অন্বেষাকে তিনি ভালোবাসতেন। কিন্তু সঠিক ভবিষ্যৎ দিতে পারছিলেন না। আনন্দের আশ্রমের একটি সমাজকল্যাণ প্রকল্প ছিল, যেখানে অনাথ বা অসহায় শিশুদের শিক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হতো। সেই কারণেই মাঝে মাঝে অন্বেষা এখানে আসত। গল্প শুনে রঞ্জনার বুকটা হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। তার মনে হলো, শিশুটির ভেতরে যেন গভীর কোনো একাকিত্ব বাস করে। একদম সেই একাকিত্ব, যা একসময় অলকবাবু ও মৃন্ময়ী দেবীর চোখে সে দেখেছিল।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সেদিন সন্ধ্যায় আশ্রমের বাগানে অন্বেষা একা বসেছিল। রঞ্জনা তার পাশে গিয়ে বসল। — "কী ভাবছ?" — "মা'কে।" — "মা'কে খুব মনে পড়ে?" অন্বেষা মাথা নাড়ল। — "রাতে ঘুমোতে গেলে বেশি মনে পড়ে।" রঞ্জনার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। — "কাঁদো?" — "না।" — "কেন?" — "মা বলত, খুব বেশি কাঁদলে আকাশের তারারা কষ্ট পায়।" রঞ্জনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। সে আলতো করে শিশুটিকে বুকে টেনে নিল। অন্বেষা কোনো আপত্তি করল না। বরং মাথাটা তার কাঁধে রেখে নিঃশব্দে বসে রইল। দূরে দাঁড়িয়ে অলকবাবু ও মৃন্ময়ী দেবী সব দেখছিলেন। মৃন্ময়ী ধীরে বললেন, — "দেখেছ?" অলকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। — "হ্যাঁ।" — "রঞ্জনার চোখে আমি বহুদিন পরে অন্যরকম আলো দেখলাম।" — "আমিও।" সেই রাতেই আশ্রমে আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। প্রদীপ সেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বয়সের ভারে শরীর দুর্বল ছিল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পরদিন সকালে সবাই দেখতে গেল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও তিনি মৃদু হাসছিলেন। অলকবাবু তার হাত ধরলেন। — "কেমন আছ?" — "এখনও বেঁচে আছি।" — "এইসব বাজে কথা বলো না।" প্রদীপবাবু হেসে উঠলেন। তারপর ধীরে বললেন, — "জানো অলক, আমি সারা জীবন একটা কথা বিশ্বাস করেছি।" — "কী কথা?" — "রক্তের সম্পর্ক মানুষকে জন্ম দেয়, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক মানুষকে নতুন জীবন দেয়।" অলকবাবু চুপ করে রইলেন। কথাটা তার হৃদয়ের গভীরে কোথাও গিয়ে আঘাত করল। কয়েকদিন পরে প্রদীপবাবু সুস্থ হয়ে ফিরলেন। কিন্তু তার কথাগুলো আশ্রমের অনেকের মনেই রয়ে গেল। বিশেষ করে অলকবাবুর। এদিকে অন্বেষা প্রায় নিয়মিত আশ্রমে আসতে শুরু করল। সে কখনও মৃন্ময়ী দেবীর গান শুনত। কখনও অলকবাবুর দাবা শেখার ক্লাসে বসে থাকত। কখনও রঞ্জনার সঙ্গে গল্প করত। কখনও সহিসের হাত ধরে বাগানে হাঁটত। ধীরে ধীরে আশ্রমের সকলের প্রিয় হয়ে উঠল সে। একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ অন্বেষা সহিসকে প্রশ্ন করল, — "তুমি কি বাবা?" সহিস চমকে উঠল। — "কেন বলো তো?" — "কারণ তোমার কাছে থাকলে আমার নিরাপদ লাগে।" সহিসের গলা শুকিয়ে গেল। সে উত্তর খুঁজে পেল না। অন্বেষা আবার বলল, — "আর রঞ্জনা আন্টি মা'র মতো কথা বলে।" সেদিন প্রথমবার সহিস অনুভব করল, এতদিনের এক অদৃশ্য শূন্যতা যেন কোথাও ধীরে ধীরে ভরাট হতে শুরু করেছে। কিন্তু ভাগ্য তখনও তার সব তাস খোলেনি। কারণ আনন্দের আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে এমন এক গোপন তথ্য সামনে আসতে চলেছে, যা শুধু অন্বেষার ভবিষ্যৎ নয়, সহিস-রঞ্জনা, অলক-মৃন্ময়ী—সবার জীবনকে নতুন মোড়ে নিয়ে যাবে। একটি বহু বছরের পুরনো উইল। একটি অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি। এবং একটি সিদ্ধান্ত, যা ভালোবাসার সংজ্ঞাকেই বদলে দেবে। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে যেমন আকাশ পরিষ্কার হয়, তেমনি জীবনের দীর্ঘ অপেক্ষার পর কখনও কখনও এমন কিছু আসে, যা মানুষকে নতুন জন্ম দেয়। আর সেই নতুন জন্মের দরজা খুলতে চলেছে খুব শিগগিরই। শরতের আকাশ তখন ধীরে ধীরে মেঘমুক্ত হচ্ছে। আনন্দের আশ্রমের বাগানে কাশফুলের মতো সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অন্বেষা এখন আর আশ্রমের অতিথি নয়, যেন পরিবারেরই একজন সদস্য। সকালে সে মৃন্ময়ী দেবীর সঙ্গে প্রার্থনায় বসে। দুপুরে অলকবাবুর কাছে দাবা শেখে। বিকেলে সহিসের সঙ্গে বাগানে হাঁটে। আর রঞ্জনা এলে তার হাত ধরে সারাক্ষণ গল্প করে। আশ্রমের সকলেই মজা করে বলতে শুরু করেছিল— — "অন্বেষা না এলে আনন্দের আশ্রমে আনন্দই আসে না।" মেয়েটা লজ্জা পেয়ে হাসত। কিন্তু তার সেই হাসির আড়ালে কোথাও একটা ভয় লুকিয়ে থাকত। একদিন রঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, — "কী হয়েছে মা?" অন্বেষা নিচু স্বরে বলল, — "তুমি যদি একদিন আর না আসো?" রঞ্জনার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। — "আমি থাকব।" — "সবাই তো একদিন চলে যায়।" রঞ্জনা আর কোনো কথা বলতে পারল না। সাত বছরের একটা শিশুর মুখে এমন পরিণত বেদনা শুনে তার চোখ ভিজে উঠল। সেই সময়েই আনন্দের আশ্রমে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত শিল্পপতি শ্রী সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের পুরনো আইনজীবী আশ্রমে এলেন। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। হাতে একটি চামড়ার ফাইল। পরিচালক অরূপবাবুকে তিনি বললেন, — "একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে। এতদিন সময় আসেনি বলে প্রকাশ করা হয়নি।" আশ্রমের পরিচালনা পর্ষদের জরুরি সভা ডাকা হলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অলকবাবু, প্রদীপ সেন, আরও কয়েকজন সিনিয়র সদস্য। ফাইল খুলে আইনজীবী বললেন, — "এটি সমরেশবাবুর শেষ উইলের একটি গোপন ধারা।" ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কোনো সন্তান ছিল না। স্ত্রীও বহু বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। জীবনের শেষদিকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—মানুষের সবচেয়ে বড় অভাব অর্থ নয়। অভাব হলো সঙ্গের। অভাব হলো পরিবারের। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি আনন্দের আশ্রম গড়েছিলেন। কিন্তু উইলে আরও একটি স্বপ্ন লেখা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন—বৃদ্ধ মানুষ এবং অনাথ শিশুদের একসঙ্গে নিয়ে একটি বৃহৎ পারিবারিক পরিবেশ তৈরি হোক। যেখানে বৃদ্ধরা শুধু আশ্রয় পাবেন না। তাঁরা দাদু-দিদা হয়ে উঠবেন। আর অনাথ শিশুরা শুধু খাবার ও শিক্ষা নয়—একটি পরিবার পাবে। আইনজীবী নথির শেষ অংশ পড়লেন। ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। উইলে লেখা ছিল—"যদি কোনো দম্পতি, যাদের সন্তান নেই, এই আশ্রমের কোনো শিশুকে আইনত দত্তক নিতে চান এবং শিশুটিও তাদের সঙ্গে থাকতে সম্মত হয়, তবে আশ্রম তাদের সমস্ত আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।" কথাগুলো পড়া শেষ হতেই অলকবাবুর বুকের ভেতর যেন কাঁপন উঠল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—রঞ্জনা। সহিস। এবং অন্বেষা। সেই রাতেই অলকবাবু ঘুমোতে পারলেন না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃন্ময়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন। — "তুমিও ঘুমাওনি?" — "না।" — "তুমি অন্বেষার কথা ভাবছ।" অলকবাবু অবাক হলেন। — "তুমি বুঝলে কী করে?" মৃন্ময়ী মৃদু হেসে বললেন, — "পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তোমাকে চিনি।" কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর তিনি বললেন, — "আমারও একই কথা মনে হচ্ছে।" অলকবাবু ধীরে বললেন, — "কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমাদের নয়।" — "জানি।" — "তবু মনে হয় ঈশ্বর হয়তো আমাদের জন্য অন্য রাস্তা খুলে রেখেছেন।" এর কয়েকদিন পরেই দুর্গাপুজো এল। আনন্দের আশ্রমে ধুমধাম করে উৎসব শুরু হলো। অন্বেষা নতুন লাল-সাদা ফ্রক পরে এসেছে। মৃন্ময়ী দেবী তাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। অলকবাবু ছবি তুলছেন। প্রদীপ সেন হেসে বললেন, — "দেখে তো মনে হচ্ছে বসু পরিবারের নাতনি।" কথাটা শুনে সবাই হেসে উঠলেও, রঞ্জনা হঠাৎ চুপ করে গেল। তার চোখ অন্বেষার মুখে স্থির হয়ে রইল। সন্ধ্যায় সিঁদুরখেলার পর আশ্রমের প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। হঠাৎ অন্বেষা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

মাইক্রোফোন হাতে নিল। সে একটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করল। তারপর সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল— — "আজ আমি একটা কথা বলতে চাই।" সবাই অবাক। — "আমি যখন খুব একা লাগত, তখন ভাবতাম পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।" ঘর নিস্তব্ধ। — "কিন্তু এখন আমার দিদা আছে।" সে মৃন্ময়ীর দিকে তাকাল। — "আমার দাদু আছে।" অলকবাবুর চোখ ভিজে উঠল। — "আর..." সে থেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে রঞ্জনা ও সহিসের দিকে তাকাল। — "আমার যদি মা-বাবা থাকত, তাহলে হয়তো ওদের মতো হতো।" মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রঞ্জনার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সহিস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মৃন্ময়ী মুখে আঁচল চাপলেন। প্রদীপ সেন নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকালেন। সেই রাতেই প্রথমবার সহিস বলল— — "রঞ্জনা।" — "হুঁ?" — "তুমি কি কখনও ভেবেছ?" — "কী?" — "অন্বেষাকে আমাদের জীবনের অংশ করার কথা?" রঞ্জনা উত্তর দিল না। কারণ তার চোখের জলই উত্তর দিয়ে দিয়েছিল। বহু বছরের নিঃশব্দ বেদনা। অসংখ্য হাসপাতালের করিডোর। অসংখ্য রিপোর্ট। অসংখ্য ভাঙা স্বপ্ন। সবকিছুর ওপরে যেন প্রথমবার একফালি আলো নেমে এসেছে। কিন্তু সামনে এখনও অনেক পথ বাকি। অন্বেষার মামির সম্মতি দরকার। আইনি প্রক্রিয়া বাকি। আর সবচেয়ে বড় কথা—অন্বেষা নিজে কী চায়, সেই সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভাগ্যের চাকা এবার ঘুরতে শুরু করেছে। সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের বহু বছর আগের উইল যেন নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। আনন্দের আশ্রম আর কেবল বৃদ্ধদের আশ্রয়স্থল নয়। এটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে—হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনর্জন্মের স্থান। ভাঙা হৃদয়ের পুনর্গঠনের স্থান। এবং এক নতুন পরিবারের জন্মভূমি। দূরে শারদরাত্রির আকাশে পূর্ণচাঁদ উঠেছে। কেউ জানে না ভবিষ্যৎ কী লিখে রেখেছে। তবে এতটুকু নিশ্চিত—একটি ছোট্ট মেয়ে, দুইজন নিঃসন্তান মানুষ, এবং দুইজন প্রবীণ হৃদয়ের জীবন খুব শিগগিরই এমন এক মোড় নিতে চলেছে, যা আনন্দের আশ্রমকে কিংবদন্তিতে পরিণত করবে। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্তের আগমনী সুর বাজতে শুরু করেছে। আনন্দের আশ্রমের বাগানে শিউলি ফুল ঝরে পড়ছে। ভোরবেলায় সাদা পাপড়ির গালিচা দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন নিজের হাতে আশীর্বাদের আসন বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে আশীর্বাদ কখনও সহজ পথে আসে না। তার আগে আসে পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষার সময় এসে গেছে। দুর্গাপূজার কয়েকদিন পর এক সন্ধ্যায় রঞ্জনা, সহিস, অলকবাবু ও মৃন্ময়ী দেবী আশ্রমের একটি নিরিবিলি কক্ষে বসেছিলেন। সামনে অন্বেষা। তার ছোট্ট হাত দুটো মুঠো করে রাখা। চোখে অদ্ভুত এক গম্ভীরতা। রঞ্জনা ধীরে জিজ্ঞেস করল, — "মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?" — "করো।" — "যদি কখনও তোমার নিজের একটা পরিবার হয়, তাহলে কেমন লাগবে?" অন্বেষা চুপ করে রইল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, — "পরিবার কি আবার পাওয়া যায়?" ঘরে যেন হঠাৎ সময় থেমে গেল। মৃন্ময়ী দেবীর চোখ ভিজে উঠল। সহিস জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। রঞ্জনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, — "হ্যাঁ, কখনও কখনও পাওয়া যায়।" অন্বেষা ধীরে ধীরে তার দিকে তাকাল। — "তাহলে আমি তোমাদের কাছেই থাকতে চাই।" এই কয়েকটি শব্দ যেন বজ্রপাতের মতো নেমে এলো। কিন্তু সেই বজ্রপাত ধ্বংসের নয়। নতুন জীবনের। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে রঞ্জনা প্রথমবার সহিসের কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল। অনেক বছর ধরে জমে থাকা কান্না। অনেক অপূর্ণতার কান্না। অনেক স্বপ্নভঙ্গের কান্না। সহিস তার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, — "কাঁদছ কেন?" রঞ্জনা ফিসফিস করে বলল, — "জানি না।" — "জানো।" — "হয়তো।" — "বলবে?" — "আজ প্রথমবার মনে হলো, ঈশ্বর আমার শূন্য কোলে একটু আলো রাখতে চাইছেন।" সহিসের নিজের গলাও কেঁপে উঠল। দশ বছর ধরে সে রঞ্জনার এই নীরব বেদনা দেখেছে। আজ যেন সেই বেদনার ভেতরে একটি প্রদীপ জ্বলেছে। কিন্তু জীবন তখনও তার শেষ পরীক্ষা নেয়নি। অন্বেষার মামি, শর্মিষ্ঠা দেবী, প্রথমে দত্তক গ্রহণের বিষয়ে সম্মতি দিতে রাজি হলেন না। তিনি খারাপ মানুষ ছিলেন না। বরং অন্বেষাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু ভয় ছিল। অসীম ভয়। একদিন আশ্রমে বসে তিনি রঞ্জনাকে বললেন, — "আমি ওকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছি।" রঞ্জনা শান্ত গলায় বলল, — "জানি।" — "তাহলে কীভাবে ছেড়ে দেব?" — "ছেড়ে দেবেন না।" — "মানে?" — "আপনি ওর মামি থাকবেন। সবসময়।" শর্মিষ্ঠার চোখে জল এসে গেল। — "কিন্তু যদি ও আমাকে ভুলে যায়?" রঞ্জনা উঠে এসে তার হাত ধরল। — "যে ভালোবাসা সত্যিকারের, তাকে কেউ ভুলে যায় না।" সেদিন দুই নারীর চোখেই জল ছিল। কিন্তু সেই জলের রং ছিল আলাদা। একজন হারানোর ভয়ে কাঁদছিলেন। অন্যজন পাওয়ার আশায়। এদিকে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলো। নথি। সাক্ষাৎকার। সামাজিক তদন্ত। আদালতের শুনানি। একের পর এক ধাপ। সহিস কখনও কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। একদিন বলল, — "এত কঠিন কেন?" প্রদীপ সেন হেসে বললেন, — "কারণ সন্তানের মূল্য কাগজে লেখা যায় না।" এর মধ্যেই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। ডিসেম্বরের এক শীতের সকালে প্রদীপ সেন হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। আশ্রমের সবাই উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে অলকবাবু। কারণ এই কয়েক মাসে প্রদীপ তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। হাসপাতালের কেবিনে একদিন প্রদীপ অলকবাবুর হাত ধরে বললেন, — "একটা কথা বলব?" — "বল।" — "সময় হয়তো বেশি নেই।" — "চুপ করো।" — "না, শুনো।" তার কণ্ঠ দুর্বল হয়ে আসছিল। — "আমি সারা জীবন সন্তান পাইনি।" অলকবাবু নীরব। — "তবু আজ আমার কোনো আক্ষেপ নেই।" — "কেন?" প্রদীপ মৃদু হাসলেন। — "কারণ আমি দেখেছি, রক্তের চেয়ে ভালোবাসা বড়।" কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি আরও বললেন, — "অন্বেষাকে তোমাদের পরিবারে নিয়ে এসো।" অলকবাবুর চোখ ভিজে উঠল। — "আনব।" — "ও শুধু একটা মেয়ে নয়।" — "জানি।" — "ও ঈশ্বরের পাঠানো দ্বিতীয় সুযোগ।" কয়েকদিন পর প্রদীপ সেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। পুরো আশ্রম স্তব্ধ হয়ে গেল। অন্বেষা সারাদিন কথা বলেনি। সন্ধ্যায় সে অলকবাবুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, — "দাদু, মানুষ মারা গেলে কোথায় যায়?" অলকবাবুর গলা ভারী হয়ে গেল। তিনি বললেন, — "যাদের ভালোবাসি, তারা কখনও পুরোপুরি চলে যায় না।" অন্বেষা আকাশের দিকে তাকাল। একটি তারা তখন জ্বলছিল। — "তাহলে প্রদীপ দাদুও ওখানে আছেন?" — "হ্যাঁ।" — "তিনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?" অলকবাবু শিশুটিকে বুকে টেনে নিলেন। — "নিশ্চয়ই।" প্রদীপ সেনের মৃত্যু যেন আশ্রমের সবাইকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। জীবন কত ছোট। আর ভালোবাসা কত বড়। অবশেষে সেই বহুল প্রতীক্ষিত দিন এল। আদালতের শেষ

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

শুনানি। বিচারক সমস্ত নথি দেখলেন। অন্বেষার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, — "তুমি কাদের সঙ্গে থাকতে চাও?" অন্বেষা এক মুহূর্তও দেরি করল না। সে রঞ্জনার হাত শক্ত করে ধরে বলল, — "আমার মায়ের সঙ্গে।" ঘরের ভেতর নীরবতা নেমে এল। রঞ্জনা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এলো। বিচারকও মৃদু হেসে উঠলেন। কয়েক মিনিট পরে আইনি স্বীকৃতি সম্পূর্ণ হলো। অন্বেষা এখন আনুষ্ঠানিকভাবে—অন্বেষা বসু। আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় অন্বেষা হঠাৎ রঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, — "মা।" একটি শব্দ। মাত্র একটি শব্দ। কিন্তু সেই শব্দের জন্য দশ বছর অপেক্ষা করেছিল রঞ্জনা। সে কাঁদছিল। সহিসও কাঁদছিল। অলকবাবু ও মৃন্ময়ী দেবীও। আকাশেও যেন সেদিন রোদটা একটু বেশি উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয়নি। কারণ সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় বিস্ময়। প্রদীপ সেনের রেখে যাওয়া একটি সিলমোহর করা চিঠি। যা খুলতে হবে তাঁর জন্মদিনে। আর সেই চিঠির ভেতরে এমন এক উত্তর লুকিয়ে আছে, যা আনন্দের আশ্রমের ইতিহাস, সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন, এবং অন্বেষার ভবিষ্যৎ—সবকিছুকে এক সুতোয় বেঁধে দেবে। শীতের সকাল। আনন্দের আশ্রমের মাঠজুড়ে নরম কুয়াশা। ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুতে সূর্যের আলো পড়ে যেন হাজার হাজার মুক্তো ছড়িয়ে আছে। আজ প্রদীপ সেনের জন্মদিন। তিনি নেই। তবুও তিনি আছেন। আশ্রমের প্রতিটি গাছের পাতায়, প্রতিটি বেঞ্চে, প্রতিটি আড্ডায়। আর আজই খোলা হবে তাঁর রেখে যাওয়া সেই সিলমোহর করা চিঠি। যে চিঠির কথা মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি নিজেই বলেছিলেন। সকালে আশ্রমের মিলনকক্ষে সবাই জড়ো হয়েছে। অলকবাবু। মৃন্ময়ী দেবী। রঞ্জনা। সহিস। অন্বেষা। আশ্রমের সমস্ত আবাসিক। পরিচালক অরূপবাবু ধীরে ধীরে খামটি খুললেন। ঘরের মধ্যে এমন নীরবতা নেমে এল, যেন সময় নিজেই থমকে দাঁড়িয়েছে। চিঠির প্রথম লাইন পড়তেই অনেকের চোখ ভিজে উঠল। "যখন এই চিঠি পড়া হবে, তখন আমি আর তোমাদের মধ্যে থাকব না। তবে মৃত্যুকে আমি বিদায় বলিনি। কারণ মানুষ মরে, ভালোবাসা নয়।" অরূপবাবুর কণ্ঠ কেঁপে উঠল। তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন। "আমি সারাজীবন একটি ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচেছিলাম। ভাবতাম সন্তান মানে নিজের রক্ত। পরিবার মানে নিজের বংশ। কিন্তু আনন্দের আশ্রম আমাকে শিখিয়েছে—পরিবার জন্মায় হৃদয়ে। রক্তে নয়।" ঘরের ভেতর অনেকে নিঃশব্দে চোখ মুছছিল। রঞ্জনা অন্বেষার হাত শক্ত করে ধরে ছিল। চিঠিতে আরও লেখা ছিল—"সমরেশ চট্টোপাধ্যায় যখন এই আশ্রম গড়েছিলেন, তখন তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন একটি পৃথিবী, যেখানে কেউ একা থাকবে না। বৃদ্ধরা শুধু অপেক্ষা করবে না। শিশুরা শুধু করুণা পাবে না। তারা একে অপরের জীবনের কারণ হয়ে উঠবে।" অলকবাবুর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। কারণ তিনি জানতেন, এই কথাগুলো শুধু দর্শন নয়। এটাই তাঁদের জীবনের গল্প। তারপর এলো সেই অংশ, যা সবাইকে স্তব্ধ করে দিল। "আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয়, আমার বইয়ের সংগ্রহ, আমার জমিজমা বিক্রির অর্থ—সবকিছু আমি আনন্দের আশ্রম ট্রাস্টের নামে দিয়ে গেলাম। আর একটি বিশেষ তহবিল গঠন করলাম। এর নাম হবে—'সন্ধ্যাতারা প্রকল্প'।" ঘরে এক অদ্ভুত আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ল। অরূপবাবু পড়তে লাগলেন—"যেসব বৃদ্ধ মানুষ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, এবং যেসব শিশু পরিবারহীন হয়ে যায়—তাদের একত্রে এনে নতুন পরিবার গড়ার জন্য এই তহবিল ব্যবহার হবে। যেন প্রতিটি বৃদ্ধ তাঁর গোধূলিবেলায় একটি সন্ধ্যাতারা খুঁজে পান। আর প্রতিটি শিশু খুঁজে পায় একটি আকাশ।" মৃন্ময়ী দেবী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, — "প্রদীপ, তুমি সত্যিই চলে যাওনি।" ঠিক তখনই অন্বেষা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। সে কিছুক্ষণ সবার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, — "আমি একটা কথা বলব?" সবাই মাথা নাড়ল। অন্বেষা অলকবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, — "যখন আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম, আমি খুব একা ছিলাম।" ঘর নিস্তব্ধ। — "আমার মনে হতো পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।" তার গলা কেঁপে উঠল। — "তারপর আমি দাদুকে পেলাম।" সে অলকবাবুর দিকে তাকাল। — "দিদাকে পেলাম।" মৃন্ময়ী কাঁদছিলেন। — "মাকে পেলাম।" রঞ্জনা চোখ মুছছিল। — "বাবাকে পেলাম।" সহিস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। অন্বেষা এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল— — "প্রদীপ দাদু ঠিকই বলেছিলেন।" — "কী বলেছিলেন মা?" মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন অরূপবাবু। — "ভালোবাসা কখনও মরে না।" সেদিন আশ্রমের প্রতিটি মানুষের মনে হলো—একটি শিশু যেন সবচেয়ে বড় সত্যটা বলে দিল। সন্ধ্যা নামল। পশ্চিম আকাশে লালচে আলো। গাছের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। অলকবাবু ও মৃন্ময়ী দেবী হাত ধরাধরি করে বাগানের বেঞ্চে বসে আছেন। অন্বেষা তাদের মাঝখানে। দূরে রঞ্জনা ও সহিস হাঁটছে। মৃদু শীতের বাতাস। অদ্ভুত প্রশান্তি। মৃন্ময়ী ধীরে বললেন, — "মনে আছে? সেই ফ্ল্যাটে আমরা দুজন সারাদিন একা বসে থাকতাম।" অলকবাবু হাসলেন। — "মনে আছে।" — "তখন ভাবতাম জীবনের শেষ অধ্যায় বোধহয় শুরু হয়ে গেছে।" — "আসলে তখন নতুন অধ্যায়ের শুরু হচ্ছিল।" অন্বেষা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, — "দাদু, গোধূলি মানে কী?" অলকবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলতে শুরু করেছে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, — "যখন দিন শেষ হতে থাকে, আর রাত আসতে থাকে, সেই সময়টাকে গোধূলি বলে।" — "আর সন্ধ্যাতারা?" অলকবাবু তার ছোট্ট আঙুল ধরে আকাশ দেখালেন। — "ওই যে প্রথম তারা।" অন্বেষা তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, — "তাহলে আমি তোমাদের সন্ধ্যাতারা?" প্রশ্নটা শুনে অলকবাবুর বুক কেঁপে উঠল। মৃন্ময়ীর চোখ আবার ভিজে উঠল। অলকবাবু শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন— — "হ্যাঁ মা।" — "খুব?" — "খুব।" — "অনেক?" — "অনেকেরও বেশি।" দূরে দাঁড়িয়ে রঞ্জনা ও সহিস সেই দৃশ্য দেখছিল। রঞ্জনা ফিসফিস করে বলল, — "দেখছ?" সহিস মাথা নাড়ল। — "হ্যাঁ।" — "বৃদ্ধাশ্রম নয়।" — "না।" — "এটা সত্যিই আনন্দের আশ্রম।" আকাশে তখন একে একে তারা ফুটছে। সমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন। প্রদীপ সেনের দর্শন। অলক ও মৃন্ময়ীর নিঃসঙ্গতা। রঞ্জনা ও সহিসের অপূর্ণতা। অন্বেষার হারিয়ে যাওয়া শৈশব। সবকিছু যেন এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে। মানুষ ভাবে জীবন শুধু পাওয়ার গল্প। আসলে জীবন পাওয়া এবং দেওয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক সেতু। যে সেতুর নাম—ভালোবাসা। আর ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হলো—সে রক্তের সম্পর্ক খোঁজে না। সে হৃদয়ের ঠিকানা খোঁজে। সেই রাতে আনন্দের আশ্রমের প্রবেশদ্বারের নিচে নতুন একটি ফলক বসানো হলো। সেখানে লেখা ছিল—"সন্ধ্যাতারা প্রকল্প" "শেষ বয়সের অবলম্বন, নতুন জীবনের সূচনা।" এবং বহু বছর পরে, যখন অন্বেষা বড় হবে, নিজের জীবন গড়বে, তখনও আনন্দের আশ্রমের বৃদ্ধেরা নতুন নতুন শিশুদের বুকে টেনে নেবেন। কারণ তারা শিখে গিয়েছিলেন—গোধূলির শেষে অন্ধকার আসে না সবসময়। কখনও কখনও সেখানে একটি সন্ধ্যাতারা জ্বলে ওঠে। আর সেই একটি তারাই যথেষ্ট হয়—একটি জীবনকে, একটি পরিবারকে, এবং একটি সমাজকে আলো দেখানোর জন্য।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



রান্না ২

কোজাগরীর আয়োজনে..



মনমিতা কুণ্ডু

শরতের আকাশে তখন ধবধবে জ্যোৎস্না। পুজোর ক'দিনের ব্যস্ততা পেরিয়ে ঘরে ঘরে নেমে এসেছে এক শান্ত, স্নিগ্ধ আবেশ। উঠোনে আলপনা, দরজার কাছে ধানের শিষ, প্রদীপের আলো আর সাদা পদচিহ্নে সাজানো ঘর যেন অপেক্ষা করে আছে ধনধান্যের দেবী লক্ষ্মীর জন্য। কোজাগরী পূর্ণিমার সেই শুভরাত্রিতে বাংলার ঘরে ঘরে তাই শুরু হয় আর এক আপন উৎসব লক্ষ্মীপুজো।

সন্ধেবেলা মায়ের হাতে পুজোর থালা সাজানো, বাড়ির মেয়েদের আলপনা দেওয়া, নতুন ধানের গন্ধ, নারকেল কোরা, মুড়ি ভাজা, নাড়ু পাকানো আর রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ঘিয়ের মিষ্টি সুবাস। লক্ষ্মীর ভোগ এখানে শুধু কিছু খাবারের সমাহার নয়, বরং ঘরের মঙ্গল, প্রাচুর্য আর ভালোবাসাকে নিবেদন করার এক চিরন্তন রীতি। কোথাও ভোগের থালায় থাকে খিচুড়ি, লাবড়া আর পাঁচরকম ভাজা, কোথাও আবার নারকেল-দুধে রান্না করা বিশেষ পদ। আবার কোনও বাড়ির লক্ষ্মীপুজো মানেই মুড়ি, চিঁড়ে, খই, নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মোয়া, পায়েস আর নানা ঘরোয়া মিষ্টির আয়োজন। অঞ্চল, পরিবার ও প্রজন্ম বদলালেও ভোগের পদগুলির মধ্যে দিয়ে আজও বেঁচে থাকে বাংলার রান্নাঘরের নিজস্ব ঐতিহ্য।

কোজাগরীর এই সংকলনে তাই একত্রিত করা হয়েছে লক্ষ্মীপুজোর ভোগের সেই পরিচিত অথচ বিচিত্র রূপ। কিছু পদ হয়তো তোমার ছোটবেলার পুজোর কথা মনে করিয়ে দেবে, কিছু পদ হয়তো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মায়ের রান্নাঘরে। কোনও পদে থাকবে উৎসবের প্রাচুর্য, কোনওটিতে থাকবে অল্প উপকরণে ঘরোয়া স্বাদের মায়া। লক্ষ্মী আসেন পরিচ্ছন্ন ঘরে, শুদ্ধ মনে, আর বাঙালির রান্নাঘরও যেন সেই আগমনের প্রস্তুতিতে হয়ে ওঠে উৎসবের আর এক মন্দির। চলুন, কোজাগরীর পূর্ণিমার আলোয় সেই গল্পগুলিই ফিরে দেখা যাক, ভোগের থালা থেকে বাংলার ঘর, ঘর থেকে স্মৃতি, আর স্মৃতি থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক অমলিন ঐতিহ্য।

শুভ কোজাগরী।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নারকেলের চিড়ে



কী কী লাগবে

নারকেল ২টি, চিনি ৪০০ গ্রাম, উষ্ণ গরম জল প্রয়োজনমতো

কীভাবে বানাবেন

নারকেল ভেঙে শাঁস বের করে বাদামি ছাল ছাড়িয়ে ৩ মিলিমিটার চওড়া লম্বা ফালি করে কাটতে হবে। ফালিগুলির দু'ধারে তেরছা করে কেটে চিড়ের আকার দিয়ে সরু করে কেটে উষ্ণ গরম জলে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। জল ঝরিয়ে চিনির পাকে নারকেল দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে হবে। চিনি শুকিয়ে নারকেলের টুকরোগুলি ঝুরঝুরে হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ছানা মাখা, চুকৈ চাটনি



কী কী লাগবে

ছানা ১ কাপ, মঙ্ক ফ্রুট সুগার ২ চামচ, এলাচ ১টি

কীভাবে বানাবেন

ছানা ভালো করে হাত দিয়ে মেখে মসৃণ করে নিতে হবে। তার মধ্যে মঙ্ক ফ্রুট সুগার ও গুঁড়ো করা এলাচ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার পুরো মিশ্রণটি কড়াইয়ে দিয়ে ঢিমে আঁচে ২-৩ মিনিট নাড়লেই তৈরি ছানা মাখা। আরও মিহি করে নিলে সেটাই হয়ে যাবে নরম ছানার সন্দেশ। ওপরে চুকৈ চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গুড়ের নাড়ু



কী কী লাগবে

নারকেল কোরানো ২ কাপ, আখের গুড় ১ কাপ, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

কড়াইয়ে ঘি গরম করে কোরানো নারকেল দিয়ে ২-৩ মিনিট নেড়ে নিন। এবার গুড় দিয়ে ঢিমে আঁচে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি আঠালো হয়ে কড়াই ছাড়তে শুরু করে। এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে আঁচ বন্ধ করে দিন। মিশ্রণটি একটু ঠান্ডা হলে হাতে সামান্য ঘি মেখে গোল গোল নাড়ু বানিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কেশর সুজি হালুয়া



কী কী লাগবে

ঘি ১/৩ কাপ, মিহি সুজি ১ কাপ, চিনি ২ কাপ, জল ৩ কাপ, কেশর ১ চিমটি, এলাচ গুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, কাজু ও কিশমিশ প্রয়োজনমতো

কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ১ টেবিল চামচ ঘি গরম করে কাজু-কিসমিস ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে আরও ২ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে সুজি সোনালি করে ভেজে নিন। অন্য পাত্রে কেশর দিয়ে জল ফুটিয়ে নিন। এবার ফুটন্ত গরম জল অল্প অল্প করে সুজির মধ্যে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। সুজি জল টেনে নিয়ে ভালোভাবে রান্না হয়ে এলে বাকি ঘি হালকা গরম করে মিশিয়ে দিন। এরপর চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। চিনি গলে জল ছাড়লে হালুয়ায় সুন্দর নরম টেক্সচার আসবে। তখন ভেজে রাখা কাজু-কিশমিশ ও এলাচ গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



চিনির নাড়ু

কী কী লাগবে

নারকেল কোরা ১টি, সাদা চিনি ১ কাপের একটু বেশি, দুধ ১/৪ কাপ, এলাচ গুঁড়ো ১/৩ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

কোরানো নারকেলে যেন কালো অংশ না থাকে। কড়াইয়ে নারকেল, চিনি ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এরপর মাঝারি আঁচে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি আঠালো হয়ে কড়াই ছেড়ে এলে এলাচ গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন। হালকা গরম থাকতেই হাতে সামান্য ঘি মেখে গোল গোল নাড়ু গড়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



নারকেল ছাপ সন্দেশ

কী কী লাগবে

নারকেল ২টি, খোয়া ক্ষীর ২৫০ গ্রাম, চিনি ৮ টেবিল চামচ, কর্পূর ১/৪ চা-চামচ, ছোট এলাচ ৫-৬টি, ঘি ১ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

খোয়া ক্ষীর ভালো করে মেখে কম আঁচে কড়াইয়ে নাড়তে থাকুন। ক্ষীর নরম হয়ে এলে চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন। নারকেল কুরিয়ে মিক্সিতে ভালো করে বেটে খোয়া ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। এলাচ গুঁড়ো দিয়ে প্রায় ৫ মিনিট নাড়ার পর খুব সামান্য কর্পূরের গুঁড়ো দিন। মিশ্রণটি থেকে তেল ছেড়ে কড়াইয়ের গা ছেড়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। ছাঁচে সামান্য ঘি মেখে মিশ্রণ ভরে ভালো করে চেপে ছাঁচ থেকে বের করে নিলেই তৈরি।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



গোলাপের ভাপা সন্দেশ

কী কী লাগবে

দুধ ১ লিটার, টকদই বা ভিনিগার প্রয়োজনমতো, গুঁড়ো চিনি ২ টেবিল চামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবিল চামচ, গোলাপ জল ১ চা-চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি প্রয়োজনমতো, পেস্তা কুচি প্রয়োজনমতো, গোলাপি এডিবল জেল রং ১ ফোঁটা

কীভাবে বানাবেন

দুধ ফাটিয়ে ছানা তৈরি করে জল ঝরিয়ে ভালো করে মেখে নিন। ছানার সঙ্গে গুঁড়ো চিনি, গুঁড়ো দুধ, গোলাপ জল ও এক ফোঁটা গোলাপি রং মিশিয়ে নরম মিশ্রণ তৈরি করুন। ঘি মাখানো টিফিন বক্সে মিশ্রণটি দিয়ে উপর থেকে পেস্তা কুচি ও শুকনো গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে ঢেকে প্রায় ২৫ মিনিট ভাপিয়ে নিন। টুথপিক পরিষ্কার বেরিয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে কেটে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ক্ষীরের নাড়ু



কী কী লাগবে

নারকেল কোরা ২ কাপ, দুধ ১ লিটার, মাওয়া ১কাপ, চিনি ১ কাপ, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ

কীভাবে বানাবেন

দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন ক্ষীর তৈরি করে নিন। এবার কোরানো নারকেল ও চিনি দিয়ে ঢিমে আঁচে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে কড়াইয়ের গা ছেড়ে এলে মাওয়া, এলাচ গুঁড়ো ও ঘি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে নামিয়ে নিন। হালকা গরম থাকতেই হাতে সামান্য ঘি মেখে গোল গোল নাড়ু গড়ে নিন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



হিং-এর কচুরি ও আলুর দম

কী কী লাগবে

ময়দা ২ কাপ, বিউলির ডাল ১ কাপ, হিং ১/২ চা-চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, মৌরি ১/২ চা-চামচ, জিরে ১/২ চা-চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন ১ চা-চামচ, চিনি ১/২ চা-চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, সাদা তেল ভাজার জন্য, জল প্রয়োজনমতো

কীভাবে বানাবেন

বিউলির ডাল কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে বেটে নিন। কড়াইয়ে সামান্য তেল দিয়ে হিং, জিরে, মৌরি ও আদা বাটা দিয়ে ডালটি নুন, চিনি ও লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে পুর তৈরি করুন। ময়দায় ঘি ও সামান্য নুন দিয়ে মেখে নরম ডো তৈরি করে ছোট লেচি কাটুন। প্রতিটি লেচির মধ্যে পুর ভরে মুখ বন্ধ করে আলতো হাতে বেলে নিন। মাঝারি আঁচে গরম তেলে ধীরে ধীরে ভেজে সোনালি করে তুলুন। গরম গরম আলুর দমের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বাসন্তী পোলাও



কী কী লাগবে

গোবিন্দভোগ চাল ২ কাপ, ঘি ৪ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, তেজপাতা ২টি, শুকনো লঙ্কা ২টি, গোটা গরম মসলা (দারুচিনি ১ ইঞ্চি, এলাচ ৩টি, লবঙ্গ ৪টি), কাজু ২ টেবিল চামচ, কিসমিস ২ টেবিল চামচ, চিনি ৪-৫ টেবিল চামচ (স্বাদমতো), হলুদ ১/৪ চা চামচ, নুন ১ চা চামচ (স্বাদমতো), গরম জল ৪ কাপ।

কীভাবে বানাবেন

চাল ৫-৬ বার ধুয়ে জল ঝরিয়ে আদা বাটা ও ২ টেবিল চামচ ঘি মাখিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে বাকি ঘি গরম করে গোটা গরম মসলা, তেজপাতা ও শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। এরপর কাজু ও কিসমিস হালকা ভেজে চাল দিয়ে কম আঁচে ৬-৭ মিনিট নাড়তে থাকুন। নুন, চিনি ও হলুদ মিশিয়ে পরিমাণমতো গরম জল দিন। ঢাকা দিয়ে ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন। ভাত সেদ্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে আরও ৩০ মিনিট ঢাকা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আগমনী ১৪৩৩

প্রবন্ধ ২

দুর্গাপুজোয় আমিষ ভোগ

দুর্গাপুজো মানেই শুধুমাত্র ধূপের গন্ধ, ঢাকের বাদ্যি, কাশফুল কিংবা নতুন জামাকাপড় নয়। বাঙালির দুর্গাপুজো আসলে এক সুবিশাল পারিবারিক উৎসব, যেখানে দেবী যেমন মহিষাসুরমর্দিনী, তেমনই তিনি ঘরের মেয়ে উমা। কৈলাস থেকে বছরে একবার বাপের বাড়িতে আসেন, চার-পাঁচ দিন থেকে আবার ফিরে যান স্বামীর ঘরে। তাই তাঁকে ঘিরে বাঙালির আবেগও অনেকখানি পারিবারিক। আর সেই পারিবারিকতার সবচেয়ে উষ্ণ প্রকাশগুলির একটি লুকিয়ে আছে ভোগের থালায়।

দেবীর সামনে সাজানো ভোগের দিকে তাকালেই যেন ধরা পড়ে একটি গোটা পরিবারের ইতিহাস, বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান, রুচি এবং বহু প্রজন্মের স্মৃতি। কোথাও অন্নভোগ নিষিদ্ধ, কোথাও ভোগের পদ হয় আলুনি অর্থাৎ নুন দেওয়া চলে না, কোথাও আবার থাকে শীতল ভোগ অর্থাৎ লুচি-মিষ্টির বিপুল আয়োজন। আর কোথাও কোথাও দেবীর পাতে মহাভোগে থাকে মাছ। মাছের ঝোল, মাছ পোড়া, কখনও বা পান্তাভাতের সঙ্গে মাছ ভাজা, দুর্গাপুজোর এই আমিষ ভোগের রীতি যতই ব্যতিক্রমী মনে হোক, বাংলার বহু পুরনো পুজো-সংস্কৃতিতে এর রেশ প্রথিত রয়েছেন বেশ গভীরে।



সুস্মিতা মিত্র

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com



বাংলার ধর্মাচরণ কখনও একরৈখিক ছিল না। একই দেবীকে একেক পরিবার একেক রীতিতে আপন করে নিয়েছে। কোথাও তিনি কঠোর শাস্ত্রাচারের দেবী, কোথাও তিনি ঘরের মেয়ে। কোথাও তাঁর পুজোয় বৈষ্ণবীয় নিরামিষ বিধান, কোথাও আবার লোকায়ত বিশ্বাস, আঞ্চলিক খাদ্যসংস্কৃতি এবং পারিবারিক প্রথার মিশেলে তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা ভোগের ধারা। ফলে দুর্গাপুজোর ভোগের ইতিহাস পড়তে গেলে আসলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই একটি অন্য দরজা খুলে যায়।

তবে প্রশ্ন আসতেই পারে, দেবীর পাতে মাছ কেন? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক।তবে এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব না। বাংলার নদী, পুকুর, বিল ও জলাভূমি-নির্ভর জীবনযাত্রায় মাছ ছিল প্রতিদিনের খাদ্যসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে বাঙালির কাছে মাছ কেবল আমিষ খাবার নয়, বহু ক্ষেত্রে তা ছিল সমৃদ্ধি, অতিথি আপ্যায়ন এবং পারিবারিক আনন্দেরও প্রতীক। দেবী যখন ঘরের মেয়ে হয়ে বাপের বাড়িতে আসছেন, তখন তাঁকে ঘরের সেরা খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করার ভাবনাও বহু পরিবারের পুজোর ভোগে জায়গা করে নিয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লোকায়ত দেবী-উপাসনার সঙ্গে দুর্গার আরাধনার মেলবন্ধন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চণ্ডী, শাক্ত উপাসনা এবং স্থানীয় দেবীসংস্কৃতির নানা ধারায় আমিষ নিবেদনের প্রচলন ছিল। সেই বৃহত্তর লোকধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবও কিছুটা দুর্গাপুজোর ভোগে এসে মিশেছে বলে মনে করা হয়। তবে প্রতিটি পরিবারের রীতি যে একই কারণে তৈরি হয়েছে, এমনটা বলা যায় না। কোনওটি পারিবারিক বিশ্বাস, কোনওটি স্থানীয় সংস্কার, কোনওটি পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া বিধি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই রীতিই হয়ে উঠেছে পরিবারের পরিচয়ের অংশ।

বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী বাড়ি:

কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। এই পুজোর ভোগেও রয়েছে আমিষের স্বতন্ত্র উপস্থিতি। ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকারি, খিচুড়ি, ভাত, পোলাওয়ের সঙ্গে দেবীর ভোগে দেওয়া হয় ল্যাটা মাছ পোড়া। দশমীর দিন আবার ভোগের চরিত্র বদলে যায়। দেবীকে নিবেদন করা হয় পান্তাভাত ও কচুশাক। এই ভোগের দিকে তাকালে মনে হয়, দেবী যেন কোনও

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

দূরের অলৌকিক সত্তা নন। তিনি এই বাংলারই মেয়ে। যে বাংলায় দুপুরের ভাতের পাতে মাছ থাকে, যে বাংলায় বর্ষার দিনে কচুশাক রান্না হয়, যে বাংলায় দশমীর বিষণ্ণ দুপুরে পান্তাভাতের সঙ্গে বিদায়ের স্বাদ মিশে থাকে, সেই বাংলারই খাবার যেন উঠে আসে দেবীর সামনে।

চক্রবর্তী বাড়ির পটের দুর্গা ও মাছ পোড়া:

মেদিনীপুরের চক্রবর্তী পরিবারের প্রায় দুই শতাব্দী পুরনো দুর্গাপুজো আরও একটি অন্যরকম উদাহরণ। এখানে মাটির প্রতিমার বদলে পটচিত্রে আঁকা দেবীকে আরাধনা করা হয়। পুজোর ভোগেও রয়েছে নিরামিষ ও আমিষ এই দুই ধারার সহাবস্থান। পুজোর শুরুতে ফলমূল ও নিরামিষ নৈবেদ্য থাকলেও পরে দেবীর ভোগে আসে মাছের নানা পদ। এখানে রুই মাছের ঝোল, মাছ পোড়া-সহ নানা আমিষ পদ নিবেদনের রীতি রয়েছে। দশমীর ভোগেও রয়েছে বিশেষত্ব, ঝিঙে, ল্যাটা মাছ এবং শোল মাছ পোড়া দিয়ে দেবীকে বিদায় জানানোর প্রথা।এই রীতির সঙ্গে পরিবারের এক বিশ্বাস জড়িয়ে আছে। দেবী বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে ফিরে যাবেন। যাওয়ার আগে তাঁকে বাপের বাড়ির খাবার খাইয়ে পাঠানো হবে, এই ভাবনাই যেন ভোগের মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। আরও একটি লোকবিশ্বাসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, কৈলাসে ফিরে শিব যখন জানতে চাইবেন, বাপের বাড়িতে কী খেয়ে এসেছেন, তখন উমা যেন বলতে পারেন, বাপের বাড়ির মানুষ খুব ধনী নয়, তাই মাছ-ভাত বা পান্তা ভাত খাইয়েই তাঁকে বিদায় দিয়েছে। এই ভাবনার মধ্যে ধর্মীয় আচারের চেয়ে বাঙালি সংসারের গল্পটাই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দশমীর ভোগে পান্তাভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছ কিংবা নারকোল দিয়ে কচুশাক ঘন্টের সম্পর্ক'ও তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুজোর প্রথম দিনগুলির জাঁকজমক, নানারকম মিষ্টি, ভোগের বিপুল আয়োজন পেরিয়ে দশমীতে এসে খাবার যেন অনেক বেশি ঘরোয়া হয়ে যায়। পান্তাভাত, কচুশাক, মাছভাজা কিংবা মাছের অম্বল, এই খাবারগুলি উৎসবের রাজকীয়তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখানেই হয়তো রয়েছে বিদায়ের আসল আবেগ। উমা তো ঘরের মেয়ে। চার দিন ধরে তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে, নতুন জামা পরিয়ে, নানা পদ রান্না করে, আনন্দ করে শেষে বিদায় দিতে হয়। তাই শেষ দিনের খাবারও যেন মায়ের বাপের বাড়ির একান্ত আপন খাবার। বাঙালি সমাজে মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার সঙ্গে যে বিষণ্ণতা জড়িয়ে আছে, দুর্গাপুজোর বিজয়ার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল। দেবী চলে যাবেন, ঘর ফাঁকা হবে, উঠোনে আর ঢাক বাজবে না, ঠাকুরদালানে আর ভিড় থাকবে না। সেই বিদায়ের মুহূর্তে পান্তাভাতের মতো সাধারণ খাবারও হয়ে ওঠে গভীর প্রতীকের বাহক। তবে আমিষ পদ মানেই শুধু মাছ নয়। দুর্গাপুজোর আমিষ ভোগ বলতে আমরা সাধারণত মাছের



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

কথাই ভাবি। কিন্তু বাঙালির ভোগ-সংস্কৃতির ইতিহাসে আমিষের ধারণা আরও বিস্তৃত। মাছের নানা পদের পাশাপাশি থাকে পাঁঠার মাংসের আয়োজনও। এমনকি বেশ কিছু মন্দিরে মা দুর্গাকে মাংস ভোগ নিবেদন করা হয়। বিশেষ করে মহাষ্টমী, সন্ধিপূজা অথবা মহানবমীতে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ বা পাঁঠা বলির প্রাচীন প্রথা রয়েছে। এই বলির মাংস দিয়ে তৈরি পদ দেবীকে অর্পণ করা হয়, যা নিরামিষ মাংস' নামে পরিচিত। 'শাস্ত্রমতে দেবীর আমিষ ভোগে কোনো ধরনের পেঁয়াজ এবং রসুন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। একে অনেক সময় 'নিরামিষ মাংস' বা 'পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া মাংসের ঝোল' বলা হয়।

কলকাতার পুরনো বনেদি বাড়িগুলির ভোগের দিকে তাকালে এই বৈচিত্র্য আরও স্পষ্ট। চোরবাগান চ্যাটার্জি বাড়ির মতো কিছু পুজোয় নির্দিষ্ট দিনে মাছের পদ ভোগে থাকে। অন্যদিকে শহরের বহু বনেদি পরিবার সম্পূর্ণ নিরামিষ রীতিতে বিশ্বাসী। কোথাও বৈষ্ণব প্রভাব, কোথাও পারিবারিক ধর্মাচার, প্রতিটি ভোগের নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে। এই কারণেই দুর্গাপুজোর ভোগকে একটি নির্দিষ্ট 'মেনু' দিয়ে বোঝা যায় না। বরং প্রতিটি বাড়ির ভোগ যেন একটি করে পারিবারিক দলিল। আরও একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। যে সব পরিবারে আমিষ ভোগের রীতি রয়েছে, সেখানে সাধারণত সেই অঞ্চলের পরিচিত মাছের ব্যবহার দেখা যায়। ল্যাটা, রুই, ইলিশ, শোল, এই মাছগুলি বাংলার জলজ জীবন ও খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অর্থাৎ দেবীর ভোগ কেবল ধর্মীয় নিবেদন নয়, তা একই সঙ্গে স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতিরও প্রতিফলন। যে অঞ্চলে যে মাছ সহজলভ্য, যে পরিবারে যে পদ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রান্না হয়ে এসেছে, সেটিই কোনও না কোনওভাবে জায়গা করে নিয়েছে দেবীর পাতে। এই দিক থেকে দেখলে দুর্গাপুজোর ভোগ বাংলার এক ধরনের খাদ্য-নৃতত্ত্বও বটে। একটি পরিবারের রান্নাঘর, একটি অঞ্চলের কৃষি, নদী-পুকুরের মাছ, ঋতুভিত্তিক শস্য, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পারিবারিক স্মৃতি, সব মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এই ভোগসংস্কৃতি। একই শহরে এত রকম আলাদা ভোগ! কলকাতার বনেদি বাড়িগুলির দিকে তাকালেই এই বৈচিত্র্যের বিস্ময় বোঝা যায়। বড়িশায় ল্যাটা মাছ পোড়া ও পান্তা-কচুশাক, আবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে অন্নভোগই নেই। সেখানে গজা, পান্তুয়া, খাস্তা কচুরি, সিঙারা, জিলিপি,



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

নিমকি, রাধাবল্লভী ইত্যাদি নৈবেদ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আবার ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়িতে রান্নায় নুন ব্যবহারের রীতিও নেই। জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়িতে বৈষ্ণব রীতি অনুসারে অন্নভোগ ও পশুবলির প্রচলন নেই। কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্র বাড়িতে রোদে শুকনো



মুগডালের খিচুড়ির বিশেষত্ব রয়েছে। চোরবাগান শীল বাড়িতে নিরামিষ ভোগের সঙ্গে পাটপাতার শুক্তোর মতো প্রাচীন পদ এখনও স্মৃতি ধরে রেখেছে। এই বৈচিত্র্যই বাঙালির দুর্গাপুজোকে এত আপন করে তোলে। দেবী একজন, কিন্তু তাঁকে ঘিরে বাঙালির ভালোবাসার ভাষা অসংখ্য। দুর্গাপুজোর আমিষ ভোগের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যাটি সম্ভবত এখানেই, দেবীকে ঘরের মেয়ে হিসেবে ভাবা। বাঙালি কল্পনায় দুর্গা কেবল অসুরদলনী নন। তিনি উমা। তাঁরও বাপের বাড়ি আছে। তাঁরও মা-বাবা আছেন। তাঁরও ফিরে আসার দিন আছে, আবার চলে যাওয়ার দিন আছে। তাই তাঁকে পাতে তুলে দেওয়া মাছের টুকরোটি কেবল একটি খাদ্যবস্তু নয়। তার সঙ্গে মিশে থাকে আদর, আপ্যায়ন, পারিবারিক স্মৃতি এবং মেয়েকে ভালো করে খাইয়ে দেওয়ার চিরন্তন বাঙালি অভ্যাস। বাপের বাড়িতে মেয়ের পছন্দের রান্না হয়। অতিথি এলে সেরা মাছটি তুলে রাখা হয়। পুজোর দিনে ঘরের মানুষের জন্য বিশেষ রান্না হয়। সেই একই আবেগ দেবীর ক্ষেত্রেও কাজ করেছে বহু পরিবারে। তাই এসবের মধ্যে শুধু ধর্মীয় আচারের ইতিহাস খুঁজলে গল্পটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর মধ্যে রয়েছে বাঙালি সংসারের অন্তরঙ্গতা।

বদলেছে সময়, বদলায়নি স্বাদ। সময়ের সঙ্গে জমিদারি নেই, অনেক বনেদি পরিবারের আর্থিক কাঠামো বদলেছে, পুরনো বাড়ির অনেক অংশ হারিয়ে গেছে, পুজোর আয়োজনও কোথাও ছোট হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বহু পরিবার এখনও তাদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ভোগের রীতি ধরে রেখেছে। কারণ এই পদগুলি শুধু রান্না নয়। এগুলি স্মৃতি। মশলার গন্ধ, ঠাকুরদালান, পুজোর ভোরে রান্নাঘরের ব্যস্ততা, ভোগের থালা সাজানো, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, প্রসাদের জন্য অপেক্ষা সব মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক ইতিহাস। প্রজন্ম বদলায়, রান্নাঘরে নতুন সরঞ্জাম আসে, শহরের জীবন দ্রুত হয়। তবু পুজোর কয়েকটি দিনে পুরনো রেসিপির খাতা খুলে যায়। পুরনো কত কি মনে পড়ে। কোন পদে কী মশলা পড়বে, কখন ভোগ নামবে, সবই যেন অদৃশ্য কোনও স্মৃতির নির্দেশে চলে। দুর্গাপুজোর ভোগ তাই আসলে সময়কে ধরে রাখার এক অদ্ভুত পদ্ধতি।

বিজয়া দশমীর বিকেল নামলে ঠাকুরদালানের আবহ যেন বদলে যায়। যে বাড়ি কয়েক দিন ধরে আলো, ধূপ, ঢাক আর মানুষের কোলাহলে মুখর ছিল, সেখানে হঠাৎ যেন বিদায়ের সুর। তবুও ছোট গল্পের ভাষায়, শেষ হইয়াও হইলো না শেষ। উমা আবার আসবেন। বাঙালি সেই আশাতেই বলে, 'আসছে বছর আবার হবে।' এই রীতি তাই বাংলার নদী-নালা, মাটি, কৃষি, রান্নাঘর, লোকবিশ্বাস, শাক্ত সংস্কৃতি এবং সবচেয়ে বেশি করে বাঙালির পারিবারিক আবেগের এক দীর্ঘ কাহিনি। আর এখানেই তো বেঁচে থাকে বাঙালির দুর্গাপুজো। মায়ের পাতে, প্রতিটি বাঙালির ঘরের গল্পে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com